দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ১৯ অক্টোবর ২০১৫।। ১ কার্তিক - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

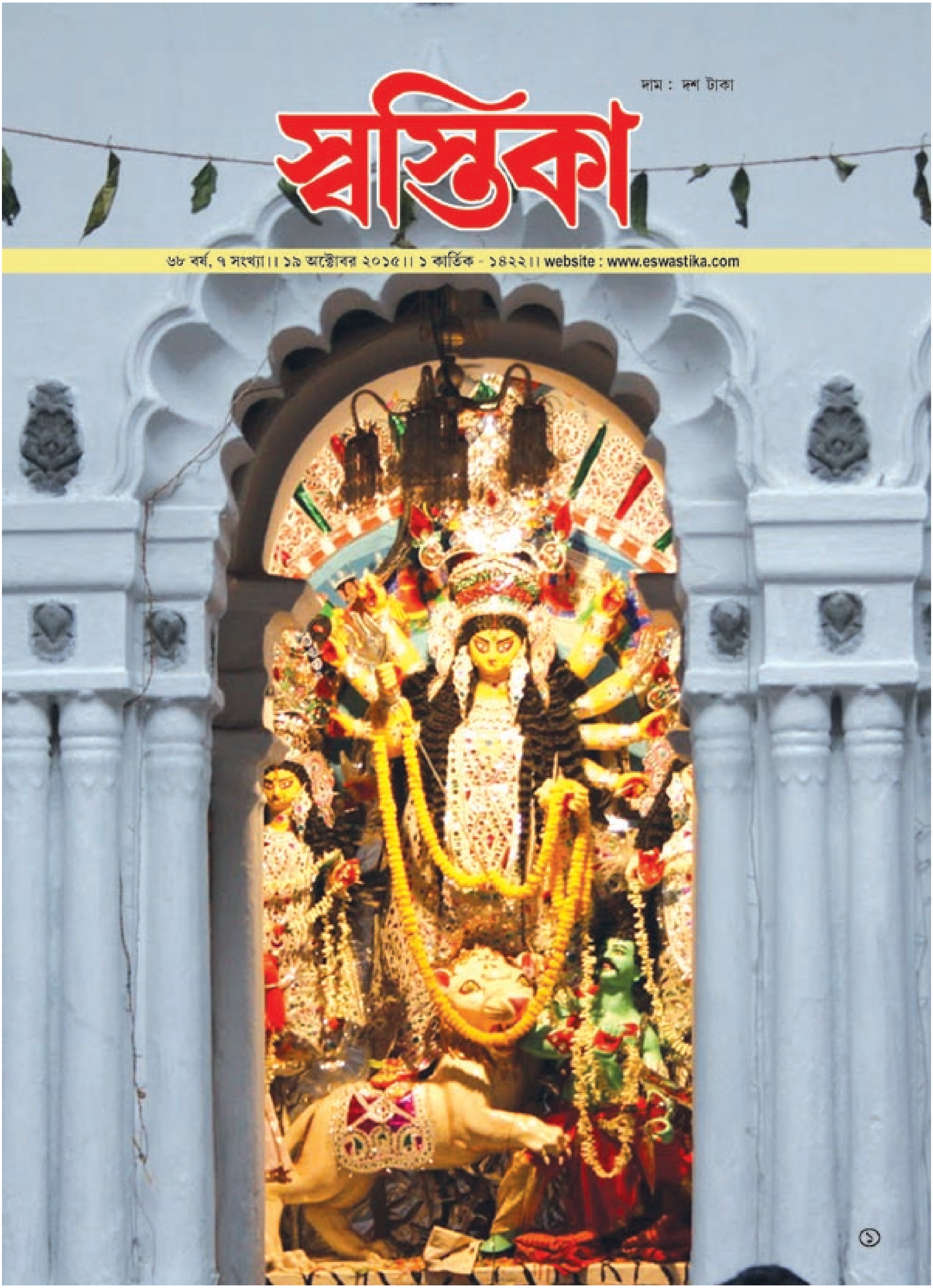

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১ কার্তিক, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১৯ অক্টোবর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

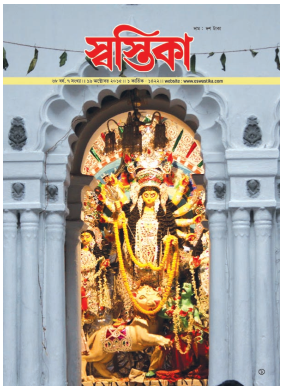

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

মমতার মনসবদারদের রেষারেষির মাঝে পড়ে সাংবাদিকরা মার খেলেন □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : চাই একশো শতাংশ আনুগত্য □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

বিশ্বের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে সংস্কার জরুরি □ সমর কুমার বোস □ ১২

পাঁতিহালের বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা □ শুভাশিস রায় □ ১৪

বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ১৬

প্রবীণ নাগরিকদের কিছু কথা, কিছু ব্যথা □ এন. সি. দে □ ২০

দুর্গাপূজা— একাল ও সেকালের ভাবনা □ শ্রীতনু কুমার রায় □ ২১

সৌদি আরবে মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার একুশ শতাব্দীতে এক বড় পদক্ষেপ □ মুজফ্‌ফর হোসেন □ ২৭

হিন্দু ভোটেই মিলে যাচ্ছে বাজিমাতের অঙ্ক, কেরল জয় বিজেপির কাছে আর দূরে নয়। □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ২৯

অর্ধশতাব্দীতেও পাকিস্তান শুধরালো না □ তারক সাহা □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬- ৩৮** □ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪১- ৪২**

প্রচ্ছদ পরিচিতি : কলকাতায় বৌবাজারে ২৩ নং নির্মল চন্দ্র স্ট্রীটের চন্দ্রবাড়ির দুর্গাপূজা।

প্রকাশিত হবে
৯ই নভেম্বর, ২০১৫

স্বস্তিকা

দীপাবলী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
৯ই নভেম্বর, ২০১৫

পশ্চিমবঙ্গ কি পশ্চিম বাংলাদেশ হতে চলেছে?

ধর্মীয় জনগণনার যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে হিন্দুদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা, সংখ্যালঘু হওয়ার কারণেই পূর্ব ও পশ্চিম— দুই পাকিস্তান থেকেই পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে হিন্দুদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। হিন্দুদের এই আশঙ্কা নিয়ে এবারের বিষয়— পশ্চিমবঙ্গ কি পশ্চিম বাংলাদেশ হওয়ার পথে? আলোচনা করেছেন অধ্যাপক মোহিত রায়, অনসূয়া চন্দ্র প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— ১০্ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

পূজাবকাশের জন্য ২৬ অক্টোবর এবং ২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের স্বস্তিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হবে না।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর পাকিস্তান নীতি যথার্থ

কিছুটা অপ্রত্যাশিত হইলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে ভারতের বিদেশনীতি অনেকটা যে সোজাসাপটা হইয়াছে তাহা বোধ হইতেছে। পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁহার ভাষণে সম্প্রতি কাশ্মীর লইয়া যে বক্তব্য রাখিয়াছিলেন, তাহা উপেক্ষা না করিয়া ভারত যে কড়া ভাষায় জবাব দিয়াছে ইহা যথার্থ হইয়াছে। ভারত যে পাকিস্তানের বক্তব্য উপেক্ষা করিবার গতানুগতিক নীতি হইতে সরিয়া আসিয়াছে তাহা এইবার দেখা যাইতেছে। শরিফের অভিযোগ হইল রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ভারত কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি ঘটনাবলি প্রমাণ করিয়াছে শরিফের তোলা অভিযোগের সহিত বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নাই। কারণ প্রধানমন্ত্রী রূপে শ্রী মোদী শপথ গ্রহণের দিন হইতেই পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক মজবুত করিবার উদ্যোগ লইয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তান সেই উদ্যোগকে সম্মান জানাইতে রাজি নয়। তাহার প্রধান লক্ষ্য ভারতে সন্ত্রাস চালাইবার নীতি। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারত কাশ্মীরকে বিসর্জন দিলে তাহার ধর্মনিরপেক্ষ নীতিরও সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় বিসর্জিত হইবে এবং ভারতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান জনগণকেও বিতাড়িত করিতে হইবে। একারণেই ভারত দাবি তুলিয়াছে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং পাকিস্তানেরই উচিত অধিকৃত কাশ্মীর ভারতকে ফিরাইয়া দেওয়া। একই সঙ্গে ভারত সঠিক ভাবেই পাকিস্তানকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার অঙ্গ হিসাবে সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করিলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হওয়া সম্ভব নহে। তাহা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। পাকিস্তানের দ্বিচারিতা লইয়া বিশ্বমঞ্চে আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা জরুরি। পকিস্তানই সন্ত্রাসের প্রধান আঁতুড়ঘর তাহা প্রমাণ করিবার সময় উপস্থিত। পাকিস্তানে আশ্রিত ওসামা বিন লাদেন তাহার প্রমাণ। আজ পাকিস্তানের ভারতনীতির অন্যতম হাতিয়ার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন ভাবে মদত দেওয়া। সন্ত্রাসবাদের মানচিত্রে পাকিস্তান হইয়া উঠিয়াছে দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থল। রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী তালিকার অনেকেই যে পাকিস্তানে আশ্রয় লইতেছে তাহা আর বিশেষ গোপন নয়। কিন্তু বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খুলিয়া দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হইয়া পরিয়াছিল। ভারত এতদিনে সেই কাজটি সঠিকভাবে করিতে পারিয়াছে। চোরের মায়ের বড় গলা লইয়া পাকিস্তান যে কর্মটি করিতেছিল তাহা বুমেরাং হইয়াছে। বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের ‘মুখ এবং মুখোশ’ সম্বন্ধে সকলকেই অবহিত করাইবার প্রয়োজন। বিগত দুই দশক ধরিয়া বিশ্বে যত সন্ত্রাস হইয়াছে পাকিস্তানের সহিত তাহার কিছু না কিছু যোগাযোগের ইঙ্গিত রহিয়াছে। আলকায়দা, বোকো হারাম এবং আই এস-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান প্রমাণ করিতেছে যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি প্রয়োজন মতো একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। বস্তুত দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা ইউরোপে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদ একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সন্ত্রাসবাদের মানচিত্রে পাকিস্তানই হইল মূল কেন্দ্রবিন্দু। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে সভ্যদেশগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার একান্ত প্রয়োজন। সেই হিসাবে ভারতের পাকিস্তান নীতি একেবারেই সদর্থক।

সুভাষিতম্

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।।
বিঘ্নৈঃ সহস্রগুণিতৈরপি হন্য মানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণাঃ ন পরিত্যজন্তি।।

বাধা আসতে পারে ভেবে অধম ব্যক্তিরা কোনো কাজ শুরুই করে না, কাজ শুরু করার পর বাধা এলে যাঁরা ছেড়ে দেন তাঁরা মধ্যম এবং হাজার বিপত্তি সত্ত্বেও কোনো কারণেই তা পরিত্যাগ করেন না তাঁরা উত্তমশ্রেণীর লোক।

বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ আইন নিয়ে হিন্দুদের ঘরে ঘরে মামলা ঢুকে গেছে

বলতে হচ্ছে, ভিক্ষে চাইনে, কুত্তা সামলাও

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে হিন্দুরা এখন দুই বিপদের মুখোমুখি। এক, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় জারি করা শত্রু সম্পত্তি আইন প্রত্যাহার চেয়ে এখন বিপদে পড়েছেন। পাকিস্তানের অংশ পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলা এখন স্বাধীন বাংলাদেশ, শত্রু ভারত এখন স্বাধীন বাংলাদেশের পরম মিত্র, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আবহমানকালের মৈত্রী আরও শক্ত ভিত্তি পেয়েছে। কিন্তু শত্রু সম্পত্তি আইনের থাবা থেকে মুক্তি মেলেনি। দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করে প্রত্যর্পণ আইন জারি করেছেন। সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ট্রাইব্যুনাল হয়েছে। কিন্তু আমলারাই এখন হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে বসেছেন। এখন হিন্দুদের ঘরে ঘরে মামলা ঢুকে গেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বলতে হচ্ছে, ভিক্ষে চাইনে, কুত্তা সামলাও। দুই, নির্যাতন-নিপীড়ন, জায়গা-জমি, দেবোত্তর সম্পত্তি দখল এখন নতুন রূপ নিয়েছে। শাসক আওয়ামি লিগের নেতাকর্মীরাই এখন এই দখল অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিএনপি-জামায়াত মাঠে নেই, আওয়ামি লিগ ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের পোয়াবারো। কোথাও কোথাও এই দখল অভিযানে মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান 'জয় বাংলা' ব্যবহৃত হচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, জায়গা-জমি ছেড়ে দিয়ে মানে মানে বিদেয় হও ভারতে। মেয়েদের ধরে নিয়ে কলেমা পরিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতে বাধ্য করা হচ্ছে। হিন্দুরা কাগজে-কলমে ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে এবং ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করার কারণে ভোট দেয় আওয়ামি লিগকে। তাছাড়া একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামি লিগই নেতৃত্ব দিয়েছিল।

এই দুই বিপদ আগেও ছিল, এখন আরও ভয়ঙ্কর ও আগ্রাসী রূপ নিয়েছে। শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় মনোভাব দেখালেও খোদ তাঁর দল আওয়ামি লিগের একটা বড় অংশ এবং আমলারা অনমনীয় সম্পত্তি ফিরিয়ে না দিতে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারাকাত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর শত্রু সম্পত্তি আইনের থাবায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দখলদারদের বড় অংশ

ফরিদপুরে এই হিন্দু জমিদারবাড়িটি দখল করেছেন ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী।

আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা। এই সম্পত্তি তারা ছাড়তে নারাজ। অন্যদিকে আমলারা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় সেই পাকিস্তানি আমলের যাটের দশক থেকে শত্রু সম্পত্তির 'প্যাঁচ কষে' বিত্তশালী হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশে সেই 'হিরের খনির লোভ' কয়েক গুণ বেড়েছে। সম্পত্তি প্রত্যর্পণ হয়ে গেলে সময় পরম্পরায় বাড়তি আয়ের স্থায়ী উৎস বন্ধ হয়ে যাবে, এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। ফলে উপেক্ষিত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আদেশ। আর হতাশা বাড়ছে হিন্দু সমাজের। এই কালো আইনের থাবায় সেই পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি দেশত্যাগের ঘটনা ঘটেছে।

হিন্দুরা দেশত্যাগ করলে সবদিক থেকে লাভ, শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তির সঙ্গে ফেলে যাওয়া সম্পত্তি কিংবা বাধ্য হয়ে জলের দরে বিক্রি করে দেওয়া সম্পত্তিও হাতে আসবে। এর মধ্যে মঠ-মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তিও আছে। হিন্দু সম্পত্তি দখলে কিন্তু রাজনৈতিক বিভাজন নেই। আওয়ামি লিগ-বিএনপি-জামায়াত-ইসলামি দল ভাই ভাই। সাম্প্রতিক সময়ে শত্রু সম্পত্তির কৌশলে সবচেয়ে বড় দখলবাজির ঘটনা ঘটেছে ফরিদপুরে। খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই (মেয়ে পুতুলের শ্বশুর) ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়) মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন ফরিদপুরে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু জমিদার বাড়ি দখল করে নিয়েছেন। জমিদারের নাতি দেশে থাকলেও কৌশলে সম্পত্তির অংশবিশেষ শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে উদ্ধারে সহযোগিতার নাম করে তাকে জবরদস্তি বিক্রি দলিলে সই করতে বাধ্য করেছেন মন্ত্রীমশাই। সঙ্গে সঙ্গে এও হুমকি দিয়ে রেখেছেন, কোনো হিন্দু যদি টুঁ শব্দ করে, ফরিদপুরে তথা বাংলাদেশে তার জায়গা হবে না। তাকেও দেশ ছাড়তে হবে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতারা এই দখলবাজির প্রতিবাদ করায় তিনি নেতৃবৃন্দকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে লক্ষণীয় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল, কিন্তু বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে মাথা কুটে মরেছে।

দ্বিতীয় বিপদ নির্যাতন-নিপীড়ন, বাড়িঘর ও দেবোত্তর সম্পত্তি জবরদখলের ব্যাপকতা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামি লিগ সরকারকে ক্ষমতায় আনতে সেই ২০০৮ সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের নির্বাচনে এবং পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়। আওয়ামি লিগকে ভোট দেওয়ার অপরাধে ২০০১ সালে দেশজুড়ে বিএনপি-জামায়াতের ব্যাপক হামলা, নির্যাতন ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল হিন্দুরা। ওই নির্বাচনে জিতেছিল বিএনপি-জামায়াত জোট। হিন্দুদের ওপর হামলা করে এই বার্তাই দিতে চেয়েছিল যে, ভবিষ্যতে আওয়ামি লিগকে ভোট দিলে এইরকম পরিণতি হবে। একইভাবে ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বন্ধ

করতে চেয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট। কিন্তু হামলা অগ্রাহ্য করে ভোটকেন্দ্রে সবচাইতে বেশি গিয়েছিল হিন্দুরা। আর তারই পরিণতিতে হিন্দুদের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন, হামলা। বাড়িঘর, মন্দির ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এখন বিএনপি-জামায়াতের এই ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছে আওয়ামি লিগ নিজেই। এবার কোরবানির ঈদে মন্দিরের সামনে গোরু জবাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে। হতবাক হিন্দুরা। আর এই কাণ্ডটি ঘটেছে খোদ রাজধানীতে, রামপুরায় প্রাচীন মহাপ্রভুর মন্দিরের সামনে। গোরু জবাই করেছেন স্থানীয় আওয়ামি লিগ নেতারা। হিন্দুরা এখন প্রতিকার চাইবে কার কাছে? বিএনপি-জামায়াত গোঁফে তা দিচ্ছে। হেফাজতে ইসলাম ও অন্যান্য ইসলামি দলগুলো বেজায় খুশি এই কর্মকাণ্ডে। বাংলাদেশকে এভাবেই দেখতে চায় তারা। তাদের কাজটি আওয়ামি করে দিলে 'তালেবানি স্বপ্ন' আর দূরে থাকে?

সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামি লিগ নেতারা জামায়াত নেতা- কর্মীদের দলে বরণ করে নিচ্ছেন। আওয়ামি লিগে যোগদানের পর হাতে ফুল তুলে দিচ্ছেন। এসব হাত মাত্র দু'বছর আগেও হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছে, মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি ভেঙেছে, হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠা বাড়ছে হিন্দুদের। বাড়ছে আতঙ্কও। যে দল মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হয়ে মানুষ হত্যা করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে, বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে জবাই করেছে, শীর্ষ নেতাদের যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচার হচ্ছে, সে দলের লোকদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল দরজা খুলে দিয়েছে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর করার কিছুই থাকে না। আওয়ামি লিগের একাংশ মনে করে, জামায়াতের নেতাকর্মীরা আওয়ামি লিগে যোগদানের ফলে দল আরও শক্তিশালী হচ্ছে। আওয়ামি লিগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা অনুমোদন করেন কিনা জানা যায়নি। তবে এখবরগুলো ফলাও করে সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে ছবিসহ। বাংলাদেশের হিন্দুদের দাঁড়াবার জায়গা কোথায়? সেই সাতচল্লিশ থেকে অনিশ্চিত পথে যাত্রা, রক্তাক্ত একাত্তরও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমাগত কমেছে, আজ এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ শতাংশের নিচে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই প্রবণতা, এই বিপদ অব্যাহত থাকলে অচিরেই বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থান পাকিস্তানের মতোই দাঁড়াবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় একটি পাকিস্তান ভারতের এপাশে।

কলকাতায় সুরিনাম ঘাটে উন্মোচিত হলো বাবা-মাই-য়ের মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত দু' শতক আগে ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আটলান্টিক উপকূলের ছোট দেশ সুরিনামে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন এদেশেরই কিছু মানুষ। সেইসব অখ্যাত নারী-পুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তথা ইতিহাসের সেই বিস্মৃত অধ্যায়কে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে কলকাতায় গঙ্গার তীরে সুরিনাম ঘাটে গত ৭ অক্টোবর একটি স্মৃতিস্তম্ভের উন্মোচন করলেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মিত হয়েছে সুরিনামের রাজধানী পারিমারিবো-তে অবস্থিত সুরিনামে পদার্পণকারী প্রথম ভারতীয় নারী ও পুরুষের প্রতিমূর্তি 'বাবা' ও 'মাই' স্মৃতিস্তম্ভটির অনুকরণে। গমনোদ্যত এই দুই মূর্তির হাতে ধরা রয়েছে পুঁটলি, বাস্তবেই যা তারা সম্বল করে সওয়ার হয়েছিলেন ছোট লড়ঝড়ে একটা জাহাজে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডাচভাষী দেশে আখের খেতে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরূপে 'লালারুখ' নামক জাহাজে (সুরিনামের উদ্দেশ্যে ভারতীয় শ্রমিকদের বহনকারী প্রথম জাহাজ) চড়ে ১৮৭৩-র জুনে সুরিনাম এসেছিলেন তাঁরা। পূর্ব-ভারতের বিশেষত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্ব প্রান্তের তৎকালীন অধিবাসীদের উত্তরপুরুষরাই আজ সুরিনামের বৃহত্তম এথনিক গোষ্ঠী। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সুরিনামের ডাচ উপনিবেশে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হলেও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহায়তায় প্রধানত বিহারের ভোজপুরী অঞ্চল থেকে প্রচুর ভারতীয় শ্রমিক ডাচ উপনিবেশে পাঠানো হয় বিভিন্ন স্থানে কলোনী স্থাপনের কাজের জন্যে। এ জায়গা ও জায়গা ঘুরে অবশেষে তাদের ঠাঁই হয় ২০ গার্ডেনরিচের কলকাতা বন্দরে। বন্দরে নামার পরেই তাদের একটা করে থালা, ঘটি, একজোড়া কুর্তা অথবা শাড়ী এবং ধুতি দেওয়া হয়েছিল। এই শ্রমিক শ্রেণীর মানুষগুলির দীর্ঘ কষ্টের কাহিনি শোনা গেল সুরিনামে নিযুক্ত ভারতীয় দূত আশনা কনেহাই-এর গলায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী বলেন, 'আমি যখন সুরিনামে ছিলাম, তখন কখনও মনে হয়নি যে আমি ভারতবর্ষের বাইরে রয়েছি। তাদের সঙ্গে আমাদের ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যা যা উৎসব পালন করি তারাও তাই করে। আর তাদের এই গুণটিই তাদের মধ্যে ভারতীয়ত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে'। মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, ওভারসীজ ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রকের এ কে আগরওয়াল এবং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের পি এস কাহ্‌লন।

গো-হত্যা পরিবেশ দূষণেরও কারণ হয়ে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গো-হত্যা বন্ধের প্রসঙ্গ উঠলেই রে রে করে মাঠে নেমে পড়ার লোকের অভাব নেই। জাতীয় স্তরে আসাদুদ্দীন ওয়াইসির মতো মুসলমান নেতারা তো বটেই, এমনকী নামের পিছনে হিন্দু পদবী ব্যবহারকারী মার্কসবাদী, সেকুলার তকমাধারী কংগ্রেসপন্থী- সহ ছোট বড় সব মাপের রাজনৈতিক দাদারাও পিছিয়ে নেই। গত এক হাজার বছর ধরে ভারতের বুকে বসবাসকারী মুসলমান সমাজকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করতে কংগ্রেসী নেতা মহাত্মা গান্ধীর মুখ থেকেও একদা উচ্চারিত হয়েছিল— ‘বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমি গো-হত্যার বিষয়টিকে স্বরাজ্যের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমার মতে, গো-হত্যা ও নরহত্যা একই মুদ্রার দুটি পিঠ’ এমনকী হিন্দু-মুসলমানের একতা প্রসঙ্গে গো-হত্যা বিরোধীতার সুর শোনা গিয়েছিল বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মোশারফ হুসেনের গলাতেও। শেষ পর্যন্ত ধর্মের ভিত্তিতেই দেশ স্বাধীন হলো বটে, কিন্তু হিন্দুদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে গো-হত্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ঊনসত্তর বছর পরেও ‘অ্যাবসোলিউটলি ইমপ্লানটেড’ হলো না। গো-হত্যা বন্ধের নেপথ্যে ধর্মানুভূতিতে আঘাত, অর্থনৈতিক ও কৃষিকাজ সম্পর্কিত কারণগুলি ছাড়াও আর যে দিকটি আলোচনায় অবহেলিত থেকে যায় তা হলো পরিবেশ-দূষণ।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়লো, জনৈক বন্ধু, রাজনৈতিক বিশ্বাসে- ধর্মনিরপেক্ষী, গো-হত্যা বন্ধের ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। কথায় কথায় গো-হত্যা প্রসঙ্গেই তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘খাদ্যাভ্যাসের স্বাধীনতা যেমন সবারই আছে, তেমনভাবেই যত্রতত্র মূত্র ত্যাগ করার স্বাধীনতাও কি আপনি ভোগ করতে পারেন?’ প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘না। আমি এটা করতে পারি না। বেশিরভাগ লোকের চোখে খারাপ লাগবে বলে নয়, পরিবেশ দূষণ হবে বলে।’ তাই এই সূত্র ধরেই বলা যেতে পারে পরিবেশ দূষণই যদি যত্রতত্র অভব্য আচরণ না করার কারণ হতে পারে, তবে গো-হত্যা কেন নয়।

পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে গো-হত্যার ভূমিকা নিয়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুগোল বিভাগের ছাত্রছাত্রী আভা লক্ষ্মী সিং, সাহেলা জামাল, শাহনাজ আহ্‌মেদ বাবা এবং মহম্মদ মণিরুল ইসলামের চালানো ফিল্ড সার্ভেতে যে তথ্যগুলি উঠে এসেছে, সেগুলি মোটেই উপেক্ষা করার মতো নয়। উক্ত ছাত্রছাত্রীদের করা ফিল্ড সার্ভেতে দেখা গেছে আলিগড়ের অলিতে গলিতে বহু সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বৈধ, অবৈধ কসাইখানা বর্তমান এবং উভয় প্রকার কসাইখানাগুলিই অত্যন্ত নিম্ন স্বাস্থ্যমানের যা পরিবেশ এবং কসাইখানা সংলগ্ন বসতি এলাকায় দূষণ সৃষ্টি করছে। এই স্থানগুলিতে মাংস প্রক্রিয়াকরণের সময় হাড়, খুর, মাংস, চর্বি সেদ্ধ করার ফলে তৎসংলগ্ন অঞ্চলের পরিবেশ এবং বসবাসরত অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের হানি হচ্ছে। ২০০৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ৮ মিলিয়ন (৮০ লক্ষ) গবাদি পশু হত্যা করা হয়েছে। ভারতে প্রায় ৩,৬০০টি বৈধ এবং ৩,২০০টি অবৈধ কসাইখানা আছে যেগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত গবাদি পশু জবাই করা হয়। আলিগড়ের বেশিরভাগ কসাইখানায় গবাদি পশু কাটার ক্ষমতা যেখানে দিন প্রতি এক হাজার, সেখানে ২৫,০০০ গবাদি পশু হত্যা করা হচ্ছে। তবে এটা কেবল আলিগড়ের চিত্র নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই কমবেশি এরকম ঘটছে। এই কসাইখানাগুলির বেশিরভাগেই জল সরবরাহ, আলো, বায়ুচলাচল ব্যবস্থা, বর্জ্য পদার্থ নির্গমন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত থাকায় দূষণের পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে। বহুবার অবৈধ কসাইখানাগুলিকে বন্ধ করার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয়নি। এমনকী আলিগড়ে দেখা গেছে প্রায় ঘরে ঘরেই গবাদি পশু হত্যার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সমীক্ষায় প্রকাশ ৮০ শতাংশ গৃহস্থলীতেই কসাইখানা গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পরিবেশ নোংরা হওয়ার ব্যাপার তো আছেই। স্থানীয় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ বারংবার এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে ক্লান্ত এবং হতাশ। দেখা গেছে এই কসাইখানাগুলির আশেপাশের অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ ও অসুস্থতার প্রকোপ বাড়ছে, যেমন কাশি, শ্বাসকষ্ট, টাইফয়েড জ্বর, জন্ডিস, আন্ত্রিক, কলেরা, আমাশা, ম্যালেরিয়া-সহ মাথাব্যথা, গা-হাত-পায়ে ব্যথা প্রভৃতি। এছাড়াও কসাইখানা বা কারখানার ইতস্তত ছড়ানো বর্জ্য পদার্থের ঢিবিতে মশা, মাছি বংশবৃদ্ধি করে, ফলে সামগ্রিকভাবেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে স্থানীয় মানুষদের বসবাস করতে হচ্ছে। সাময়িক আর্থিক লাভের জন্য গবাদি পশু হত্যা ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের ফলে যেভাবে মাটি, জল ও বায়ু দূষণ ঘটেছে এবং মানুষের উপর এর প্রভাব পড়ছে তাতে সুদূরপ্রসারী ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের (দিল্লী সহ ভারতের ২১টি রাজ্যে গো-হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে) সংখ্যালঘু দরদী, ধর্মনিরপেক্ষীদের ধর্মীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে পরিবেশ রক্ষা এবং হাজার হাজার মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে এবং আইনত একে নিষিদ্ধ করতে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসা উচিত বলেই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা মনে করেন।

স্বস্তিকার পূজা সংখ্যার উন্মোচন ও লেখক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১০ অক্টোবর কলকাতায় কেশব ভবনে 'স্বস্তিকা'র পূজা সংখ্যার উন্মোচন ও লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার পায়ে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট লেখক তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস। তিনি বলেন, ভারতবর্ষকে জানতে, বাংলাকে জানতে, বাংলার পরিবর্তনকে বুঝতে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা পড়তে হবে। ড. বিশ্বাস ছাড়াও প্রধান অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিতি ছিলেন বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ নৃপেন প্রসন্ন আচার্য এবং স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের সম্পাদক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও সাহিত্যিক রমানাথ রায়, এষা দে, গোপাল চক্রবর্তী, সমর মিত্র, প্রাবন্ধিক মোহিত রায়, দেবপ্রসাদ রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, দেবব্রত ঘোষ, দেবব্রত চৌধুরী, এনসি দে, ভাস্কর ভট্টাচার্য, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্যিক রমানাথ রায় বলেন, স্বস্তিকার বিষয়বস্তু পাঠ করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়ে আমরা পৌঁছতে পারি। এছাড়া উপস্থিত সকলেই স্বস্তিকার প্রচারের জন্য উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে জানান। এমনকি অর্ধশতাব্দী পার করা 'স্বস্তিকা'-র হিন্দী সংস্করণ প্রকাশের কথাও ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক নবকুমার ভট্টাচার্য ও সুকেশ মণ্ডল।

অবৈধ গো-মাংস রপ্তানি আটকাতে পরীক্ষাগার তৈরি হচ্ছে বন্দরগুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গো-হত্যা ও গো-মাংস নিষিদ্ধকরণ-কে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে উদ্ভূত উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই রপ্তানিযোগ্য গবাদিপশুর মাংস পরীক্ষার জন্য বন্দরগুলিতে পরীক্ষাগার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। ভারত থেকে গোমাংস রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মহিষের মাংসের সঙ্গেই গোমাংস রপ্তানির অভিযোগ ওঠায় কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও ইতিপূর্বেই বন্দরগুলিতে 'মিটনেট' নামক সফট্ওয়ারটির মাধ্যমে গবাদি পশুর মাংস পাচারের উপর কড়া নজর রাখা হোত। তবে এর পাশাপাশি পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা হওয়ার সিদ্ধান্তে নজরদারি আরোও কঠোর হবে বলে এপিইডিএ (অ্যাগরিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) মনে করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুম্বই বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে সবথেকে বেশি পরিমাণ মাংস রপ্তানি হয়। ২০১৪-তে মাংস রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রাজিলকে টপকে ভারত একনম্বরে চলে এসেছিল। ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত রপ্তানিকৃত মাংসের পরিমাণ ছিল ২ মিলিয়ন টনেরও অধিক। কেন্দ্রের কৃষি প্রতিমন্ত্রী সঞ্জীব বালান গত ৬ অক্টোবর দাবি করেন বন্দরে মিটনেট সফটওয়্যার ব্যবহার করার ফলে এই বছরের এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে মহিষের মাংস রপ্তানি অনেক কমে গেছে। তবে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে গোহত্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্র কোনো নতুন মডেল আইন আনার পরিকল্পনা করেছে কিনা তা জানা নেই বলে জানিয়েছেন শ্রী বালান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সমগ্র দেশে ৪৯টি গো-মাংস রপ্তানিকারক কেন্দ্র এপিইডিএ দ্বারা স্বীকৃত, যার মধ্যে ২০টি আছে উত্তরপ্রদেশে। সমগ্রদেশে স্বীকৃত গো-হত্যা কেন্দ্রের সংখ্যা ১,৬৯৬।

মমতার মনসবদারদের রেষারেষির মাঝে পড়ে সাংবাদিকরা মার খেলেন

সম্প্রতি তিনটি পুরসভার ভোটে ১৯-২০ জন সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিকরা তৃণমূলের গুণ্ডাদের হাতে বেদম মার খেয়েছেন। অথচ সাংবাদিক পেটানোর সামান্যতম প্রয়োজন ছিল না। বিনা হাঙ্গামাতেই তৃণমূল প্রার্থীরা হৈ হৈ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জিততেন। কিন্তু তা হয়নি। কারণ গুণ্ডাদের সর্দারদের মধ্যেই গোল বেঁধেছিল কে বেশি শক্তিধর তাই নিয়ে। মমতার এইসব মনসবদাররা নির্বাচনকে যুদ্ধ বলে মনে করে। শুরু হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষার। লেকটাউনের গুণ্ডার সর্দার বড় না রাজারহাটের তাই নিয়ে রেষারেষি। সাংবাদিকরা এই রেষারেষির মাঝে পড়ে মার খেয়ে গেলেন। ভুলে যাবেন না ঠিক এই কায়দায় তিন দশকেরও বেশি বাঙালি ভদ্রলোক কমিউনিস্টরা স্কুল কমিটির নির্বাচন থেকে বিধানসভার নির্বাচন পর্যন্ত গুণ্ডাদের রাস্তায় নামিয়ে ভোট করিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনকে গুণ্ডামির স্তরে রাস্তায় নামিয়ে আনার জঘন্য কাজটি জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবুরা করে গেছেন। বাঙালি কমিউনিস্টরা নির্বাচকদের মনে করতেন আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট ইত্যাদি ছিল বামপন্থী কৌশল। তৃণমূলের গুণ্ডবাহিনীর জন্মদাতা রাজ্যের কমিউনিস্টরা। পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষে যাঁরা থাকবেন তাঁদের পা চাটাই হচ্ছে গুণ্ডাদের একমাত্র শিক্ষা। জন্মদাতারা যতকাল ক্ষমতায় ছিল ততকাল গুণ্ডারা তাদের ক্রীতদাস ছিল। এখন জন্মদাতা কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় নেই। তাই গুণ্ডারা তাদের 'মাই বাপ' বলে সেলাম ঠোকে না। তবে একদা তাদের নুন খেয়েছিল বলে এখনও পেটায় না। লক্ষ্য করে দেখবেন সল্টলেক, বালি, আসানসোল কোথাও রাজ্যস্তরের কমিউনিস্ট নেতারা মার খায়নি। সাংবাদিকরা না ঘর কা না ঘাটকা। বেওয়ারিশ মাল। যত খুশি পেটান কেউ বাধা দেবে না। সব রাজনৈতিক দলই চায় সাংবাদিকদের পেটানো হোক। এরা বড়ই ঠোঁটকাটা। দুর্নীতিগুলোকে টেনে বের করে

গূঢ় পুরুষের

কলম

পাবলিককে জানিয়ে দেয়। ক্ষমতায় আসার পর একটু মোটাসোটা হলেই সাংবাদিকদের চোখ টাটায়। জনগণ দুষ্টের দমনের জন্যই তো ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাই দুষ্ট সাংবাদিকদের একটু কড়কে দিতেই হয়। তা' নিয়ে এত হৈচৈ করার কী আছে?

স্বাধীনতার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিক পেটানোর রেওয়াজ চলে আসছে। কংগ্রেস আসলে ১৯৫৩ সালের ২২ জুলাই কলকাতা ময়দানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে কলকাতা পুলিশ কর্তব্যরত ২৫ জন সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিককে বেধড়ক পেটায়। তখন ক্ষমতাসীন সরকার মনে করতো সাংবাদিকরা সকলেই কমিউনিস্ট সমর্থক। সুতরাং পেটানো উচিত। ডাঃ রায় এবং তাঁর সরকারের মন্ত্রীরা বলতেন সাংবাদিকরা কুকুরের মতো শুধুই দুর্নীতির গন্ধ শুঁকে বেড়ায়।

সেই শুরু। সাংবাদিক পেটানোর ঐতিহ্যে পশ্চিমবঙ্গ দেশের শীর্ষে। ভোটের সময় দলীয় সন্ত্রাস লুকোতে সিপিএম নিয়ম করে সাংবাদিকদের পিটিয়েছে। এই সল্টলেকের পুরভোটের নির্বাচনে লালঝাণ্ডাধারীরা ২০০০ সালের ২৫ জুন সাংবাদিক পেটানোর রেকর্ড করেছিল। তখন অসীম দাশগুপ্ত, রমলা চক্রবর্তীরা সাংবাদিকদের মার খাওয়ার বিরুদ্ধে একটি বাক্য খরচ করেননি। এখন তৃণমূল পেটাচ্ছে বলে মায়াকান্না জুড়েছেন। সপ্তম বামফ্রন্টের অর্থমন্ত্রী এই অসীম দাশগুপ্ত ২০১১-র বিধানসভার নির্বাচনের আগে সাংবাদিকদের পেনসন প্রবন্ধের নামে প্রতারণার ফাঁদ পেতে ছিলেন। এই নিষ্ঠুর প্রতারকরাই এখন সাংবাদিকদের লাঞ্ছনায় মায়াকান্না জুড়েছেন।

কর্তব্যরত সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরা রাজনৈতিক গুণ্ডা অথবা পুলিশের হাতে মার খেলে নিঃসন্দেহে তা প্রতিবাদযোগ্য। কিন্তু সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে এমনটা হতেই পারে। ভারত কেন সারা বিশ্বেই সাংবাদিকতা সবচেয়ে বিপজ্জনক পেশা। মনে রাখতে হবে যে, সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই পেশায় আসেন।

ভারতীয় সংবিধান বা দেশের অন্যান্য আইনে সাংবাদিকদের বিশেষ কোনো রক্ষাকবচ দেওয়া হয়নি। একজন সাধারণ নাগরিক যে মৌলিক অধিকার পান, সাংবাদিকরাও তাই পান। আলাদা কিছু নেই। নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদের কিছু বুথের ভিতর প্রবেশের অনুমতি দেয়। তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এই অনুমতিপত্রের অধিকারও স্বীকার করেন না। সংবিধান, আইন ওই সবই পার্থবাবুর বুদ্ধির বাইরে। তিনি মনে করেন দলের দিদিই সংবিধান, দেশের আইন। মমতা হিটলার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দীর্ঘজীবী হোক!

চাই একশো শতাংশ আনুগত্য

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

প্রাক-পূজা অভিনন্দন। পুজোর দিনগুলোতে যতই স্বাধীন আনন্দ করুন মনে রাখবেন একশো শতাংশ আনুগত্য যেন থাকে। শুধু মা দুর্গার প্রতি নয়, মা-মাটি-মানুষের নেত্রী দিদির ওপরেও।

প্রথমে মনে করা হয়েছিল সংবাদমাধ্যমের প্রবল সমালোচনা সহ্য করতে না পেরেই পদত্যাগ করেছেন সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায়। অনেকে ভেবেছিলেন, মানবিক কারণেই তিনি সরে গেলেন। কিন্তু পরে জানা গেল, শাসকদলের অসহ্য চাপই তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করে। আরও পরে দেখা গেল শুধু চাপ নয়, রীতিমতো শাসকের থেকে পদত্যাগের নির্দেশই পেয়েই স্বশাসিত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রধান চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যপালকে। আর এর কিছু পরেই ভুটান থেকে খবর এল, মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী পরিবহণ সচিব এবার বসবেন নির্বাচন কমিশনারের চেয়ারে।

২০১৫-র ৬ অক্টোবর মনে করিয়ে দিল ২০১২ সালের ১৪ মার্চের কথা। সেদিনও মমতার একশো শতাংশ আনুগত্য প্রকাশ করতে না পারায় এক মুহূর্তে চেয়ার চলে গিয়েছিল তৎকালীন রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীর। মমতার পছন্দের দীনেশ ততদিনই পছন্দের ছিলেন, যতদিন তিনি নেত্রীর প্রতি একশো শতাংশ আনুগত্য দেখাতে পেরেছিলেন। কিন্তু নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনেন দীনেশ। তাঁর প্রথম রেল বাজেটে দিদির নীতি না মেনে ভাড়া বাড়ানোর ঘোষণা করেন তিনি। প্রথমে দল-বিরোধী বাজেট বুঝতে না পেরে দীনেশকে সমর্থনও করে দিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তখন তো আর তাঁরা দিল্লীতে বসে জানেন না নেত্রী কতটা ক্ষিপ্ত। সেদিন ছিল নন্দীগ্রাম দিবস। পূর্ব মেদিনীপুর যাওয়ার পথে গাড়িতেই মমতা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এক মুহূর্তও তিনি দীনেশকে রেলমন্ত্রীর পদে দেখতে চান না।

সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীকে। তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর একান্ত নির্ভরশীল নড়বড়ে ইউপিএ সরকার তা মেনেও নিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়া নজির তৈরি করে রেল বাজেট পেশ করার পর সরে যেতে হল রেলমন্ত্রীকে। একই দলের নতুন রেলমন্ত্রী এসে বদলে দিলেন বাজেট। একেবারে নেত্রীর নির্দেশিত পথে মুকুল রায় পেশ করলেন নয়া রেল বাজেট। একশো শতাংশ আনুগত্য দেখাতে না পেরে মমতার আশীর্বাদে বঙ্গেশ্বর হয়ে ওঠা মুকুল রায় এখন রাজ্য রাজনীতির তৃতীয় সারিতে।

দীনেশ ত্রিবেদী, মুকুল রায়দের মতো সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায়ও দীর্ঘ সময় একশো শতাংশ আনুগত্য দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকারকে বারবার নাস্তানাবুদ করা প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডের অবসরের পর হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জায়গায় নিজেরই ঘনিষ্ঠ ডব্লিউ বি সি এস অফিসার সুশান্তবাবুকে এনেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, কেন একজন ডব্লিউ বি সি এস অফিসারকে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে বসানো হচ্ছে? তখন বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে 'কাঠের পুতুল' বানাবেন বলেই মুখ্যমন্ত্রী সুশান্তবাবুকে ওই পদে আনলেন।

সুশান্তবাবু দায়িত্ব নিয়েই আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভা-সহ আশিটি পুরসভা নির্বাচনে। তখন শাসকশ্রেণী ভোটে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠালেও সেটাকে খুব একটা পাত্তা দেননি সুশান্তবাবু। কিন্তু বিধাননগর, বালি এবং আসানসোল পুরসভার নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যম এবং বিরোধীদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে যান তিনি। কারণ, এবারের ভোটে শুধু কারচুপিই নয়, নজিরবিহীন সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয় শাসক দল। এমনকী, সাংবাদিকদের ওপর লাগামছাড়া হামলা চালাতেও পিছপা হয়নি তারা। আর সেই সব অপকর্মের অনেকটাই ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। বুথের ক্যামেরা ঘুরিয়ে দিয়ে, মিডিয়ার ক্যামেরা ভেঙে দিয়েও সবটা আটকানো যায়নি। আর সেই সব ছবি দেখেও চোখ বুজে থাকাটা সম্ভব ছিল না। একশো শতাংশ আনুগত্য প্রকাশ করার মতো যুক্তি মেলেনি। তাই কার্যত বাধ্য হয়েছিলেন, গণনার দিন পিছিয়ে দিয়ে কিছুটা সময় নিতে। আর তাতেই রোষের মুখে পড়ে গেলেন সুশান্তবাবু। চাপ তৈরি করতে নেত্রীর নির্দেশে নির্বাচন কমিশন অফিসের নীচে ধরনায় বসে যায় তৃণমূল কংগ্রেস। আরও চাপ বাড়াতে নেত্রীর নির্দেশে দলে মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বকসি ও মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় সুশান্তবাবুকে কার্যত ঘিরে ধরেন। এরপরও সুশান্তরঞ্জন ভেবে উঠতে পারেননি সন্ত্রাসের এমন জ্বলন্ত নমুনা থাকার পরও কীভাবে তিনি শাসকের সব দাবি মেনে নিয়ে বলবেন 'নির্বাচন শান্তিপূর্ণ'। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়ে রেখেছে। ফলে আদালতে ভর্ৎসিত হওয়ার ভয়ও ছিল। একসময় তাই আত্মসমর্পণ করেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তিনি। এবার একশো শতাংশ আনুগত্য প্রকাশের চ্যালেঞ্জ আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে।

— **সুন্দর মৌলিক**

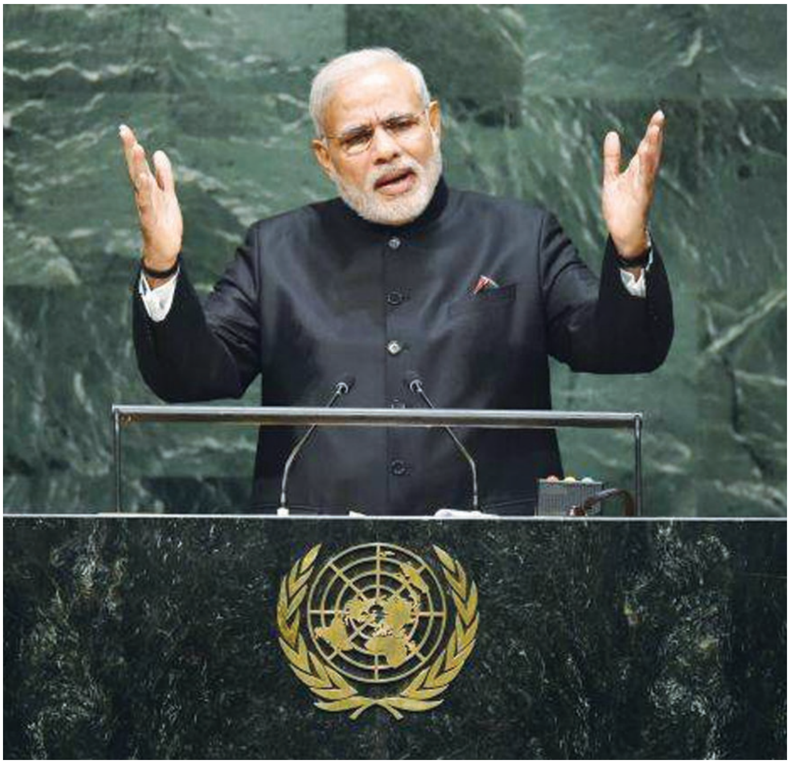

বিশ্বের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে সংস্কার জরুরি

সমর কুমার বোস

"রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে সুচারু সমাধান না হলে সন্ত্রাসবাদের চাঁইদের বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে না। জি-৪ সহ অন্যান্য দেশগুলিরও যে এক্ষেত্রে একটি ভূমিকা আছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণসভার ফাঁকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রের সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেওয়ার কথাও জানালেন।"

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভাষণ দিতে দিতে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুকে আলোচনার মধ্যে এনে গোটা বিশ্বের দৃষ্টি ভারতের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জি-৪ ভুক্ত দেশ অর্থাৎ ভারত, জাপান, জার্মান ও ব্রাজিলকে নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে সংস্কার আনার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেবার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্র সংস্কার আনার জন্য ২০০৪-এ জি-৪ তৈরি হবার পর থেকেই দাবি করে আসছে। কিন্তু এবার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেবার কথা বলে ইউ এন ও-কে চাপে রেখে দিলেন শ্রীমোদী। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হওয়ার পথে ভারতকে আরোও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন তিনি। আই এস আই এস-কে রোখা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং একে আটকাবার জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশকে এক যোগে মেকাবিলা করতে হবে। আলকায়দা, আইসিস, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, আল-শা-বাব বা বোকো হারাম এদের নৃশংস হিংসার খবর বিশ্বকে অনবরত আতঙ্কিত করে চলেছে। এদেরকে রুখতে ও খতম করতে হলে সব দেশকে একসঙ্গে লড়তে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চ থেকে তিনি এই বার্তা সারা বিশ্বকে দিয়েছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে সংস্কার আনার জন্য প্রচেষ্টা অনেকদিন ধরেই চলেছে। কিন্তু এবার তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস গঠিত

হয় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কিন্তু লীগ অব নেশনস ব্যর্থ হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেক বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারত সমেত ৫০টি দেশ আমেরিকায় সানফ্রান্সিসকোতে ১৯৪৫ সালে মিলিত হয় এবং ইউ এন চার্টার প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হয় ২৬ জুন। তা কার্যকরী হয় ২৪ অক্টোবর থেকে। সেই জন্য ২৪ অক্টোবর ইউ এন ডে হিসাবে পালিত হয়।

ইউ এন চার্টার অনুসারে ইউ এন এ-এর উদ্দেশ্য হলো—

(১) পৃথিবীতে শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখা।

(২) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

(৩) পৃথিবীর সমস্ত জনগণের মধ্যে মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা ও তার প্রতি সম্মান রাখা।

(৪) সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক সমস্যার সমাধান সম্মিলিতভাবে করা।

(৫) সম্মিলিতভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সর্বজনীন উদ্দেশ্যপূর্তির জন্য।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ছয়টি অঙ্গ—

The General Assembly, The Security Council. The Economic and social Council,The Trusteeship Council, The International Court of Justice এবং Secretariat. এই ছয়টি অঙ্গের নির্দিষ্ট কাজ আছে। জেনারেল অ্যাসেম্বলি সদস্য দেশের সদস্য নিয়ে গঠিত। সব সদস্য দেশ পাঁচজন পর্যন্ত সদস্য পাঠাতে পারে কিন্তু একটাই ভোট দেবার অধিকার আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি এখানে আলোচিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠর ভোটে গৃহীত হয়।

এই নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সিকিউরিটি কাউন্সিল নিয়ে। সিকিউরিটি কাউন্সিল (নিরাপত্তা পরিষদ)-এর মূল কাজ হলো বিশ্বে শান্তি বজায় রাখা, কোনো বিতর্ক হলে তার সমাধানের জন্য পথ প্রদর্শন করা যাতে শান্তিপূর্ণ সমাধান হয় এবং এই কাজের জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিল সম্মিলিত মিলিটারি ফোর্স গঠন করা যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য দেশগুলির দেওয়া সেনা যাকে পীস কিপিং ফোর্স বা শান্তিবাহিনী বলে। কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে ১৫ জন সদস্য আছে তার মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য আর বাকি ১০ জন অস্থায়ী সদস্য যা জেনারেল অ্যাসেম্বলি থেকে দু' বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। ৫টি স্থায়ী সদস্য হলো—ইউ এস এ, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স এবং চায়না। এই স্থায়ী সদস্যরা ভেটোর অধিকারী অর্থাৎ কোনো রেজুলুসন বা প্রস্তাব যদি সব সদস্যদের দ্বারা সমর্থিত হয় তাও সেই রেজুলুসন পাশ হবে না যদি কোনো স্থায়ী সদস্য ভেটো প্রয়োগ করে তার বিরুদ্ধে। সুতরাং বুঝতেই পারা যাচ্ছে সমসাময়িক পাঁচটি শক্তিধর রাষ্ট্রের দাদাগিরি। সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাব ইউ এন ও-র অন্য বিভাগগুলোতেও আছে। ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের জন্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি এবং সিকিউরিটি কাউন্সিল ১৫ জন বিচারক নিয়োগ করে বিভিন্ন দেশ থেকে ৯ বছরের মধ্যে। ৫ জন বিচারককে প্রতি তিন বছর অন্তর অবসর নিতে হবে। এছাড়া ইউ এন ও-র চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার বা সিকিউরিটি জেনারেলের নিয়োগ জেনারেল অ্যাসেম্বলি করলেও সুপারিশ করে সিকিউরিটি কাউন্সিল। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে ইউ এন ও-র গঠনতন্ত্রে শক্তিধর দেশগুলোর প্রাধান্য। ইউ এন ও-র অফিসিয়াল কাজ যে ৬টি ভাষায় চলে তা হলো— ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, স্প্যানিস, চাইনিজ ও আরবি। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিন্দিতে কথা বললেও হিন্দি কিন্তু ইউ এন ও-র অফিসিয়াল ভাষা নয়। ইউ এন ও-র ৭০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে, এই সংস্থার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পক্ষপাতমূলক। ভারতের কাশ্মীর নিয়ে ইউএনও-র ভূমিকা নক্কারজনক। তাই সম্ভবত ১৯৫২ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন, ইউএনও-র উপর আমাদের ভরসা করলে চলবে না, বরং দরকার হলে কাশ্মীর সমস্যাকে ইউএনও থেকে তুলে নিতে হবে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হবার সময় তার নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য দেশ ছিল মাত্র চারটি— আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী চতুঃশক্তি। স্বভাবতই সময় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশগুলি থেকেও দাবি ওঠে এই চারটি শক্তির বাইরে অন্য কোনো দেশকেও সদস্য পদের অধিকার দেওয়া হোক। বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত দেশ জার্মানি, ইতালি বা জাপানকে সদস্য করতে রাজি ছিল না বিজয়ী দেশগুলি। বরং নিরপেক্ষ থাকা বা পরাধীনতার কারণে মিত্রপক্ষে থাকতে বাধ্য হওয়া দেশগুলির মধ্যে যে কোনো একটিকে সুযোগ দিতে তারা বদ্ধপরিকর ছিল। আবার বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহাদেশ এশিয়ার কোনো প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে না থাকায় বিষয়টিও দৃষ্টিকটু ঠেকছিল সকলের কাছে। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে ১৯৫৫ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভারত ও চীনের মধ্যে যে কোনো একটি দেশকে নিরাপত্তা পরিষদে নেওয়ার।

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হওয়ায় আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স (যারা নিজেরাও গণতান্ত্রিক) ভারতকে সমর্থন করে আর কমিউনিস্ট রাশিয়ার সমর্থন স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট চীনের দিকে। ৩-১ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ভারতের তখনই নিরাপত্তা পরিষদ স্থায়ী আসন পাবার কথা। কিন্তু চরম অবিমৃষ্যকারী প্রধানমন্ত্রী নেহরু কোনো অজ্ঞাত কারণে সেই স্থায়ী সদস্যপদ চীনকে উপহার দেন। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সেই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের কোনো জুরি আজও পাওয়া যায় না।

সুতরাং ইউএনও-র গঠনতন্ত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দরকার এবং মোদীজীর উদ্যোগে ভারত, জাপান, জার্মানি ও ব্রাজিল অর্থাৎ জি-৪ই শুধু নয়, আরো সদস্যভুক্ত দেশকে এই আন্দোলনে সামিল করে এগিয়ে যেতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রে সুচারু সমাধান না হলে সন্ত্রাসবাদের চাঁইদের বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে না। জি-৪ সহ অন্যান্য দেশগুলিরও যে এক্ষেত্রে একটি ভূমিকা আছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণসভার ফাঁকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্রের সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেওয়ার কথাও জানালেন। ∎

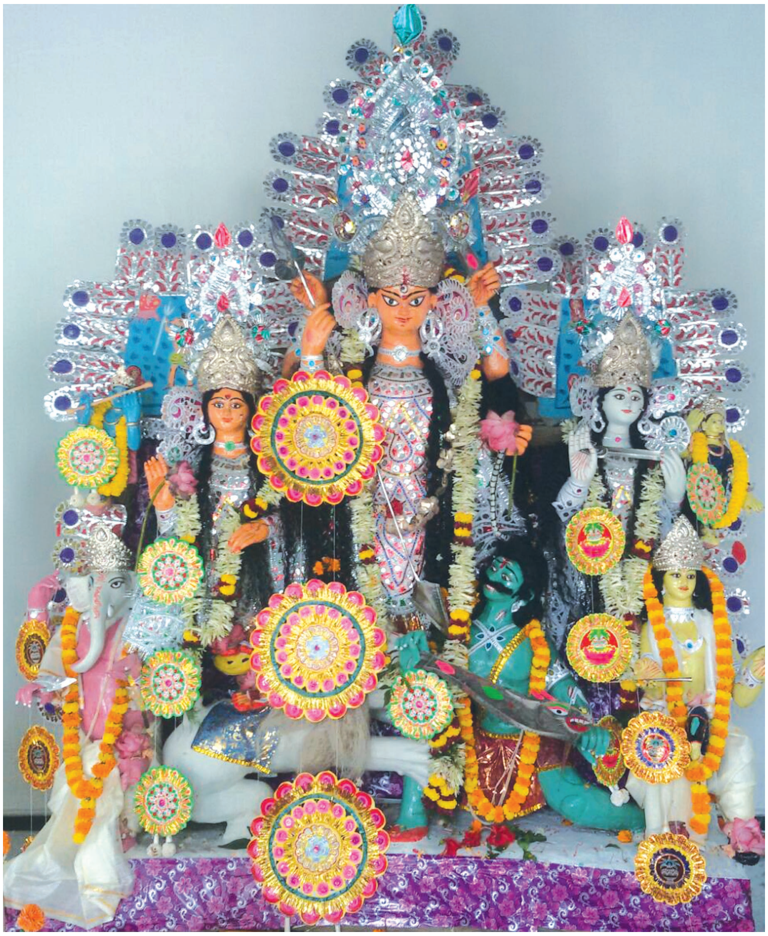

রায়বাড়ির দুর্গা প্রতিমা।

পাঁতিহালের বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা

শুভাশিস রায়

দীর্ঘ একবছরের প্রতীক্ষা শেষে মর্ত্যে মায়ের আগমন। পঞ্জিকা মতে এবার ঘোড়ায় চড়ে দেবী আসছেন আর দোলায় চেপে মা গমন করছেন। মায়ের স্থিতি এবার হাতেগোনা মাত্র তিনদিন। কিন্তু তার প্রস্তুতি বিগত বেশকয়েক মাসের। তবে শেষ লগ্নের চরম ব্যস্ততা চোখে পড়ে দেবীপক্ষের সূচনা হতে। হাজারো দুঃখ-কষ্ট ভুলে দেবীর আরাধনায় মগ্ন হয়ে ওঠে আপামর বাঙালি। শরতের উড়ো মেঘ আর কাশের দোলায় এক অনন্য অনুভূতির মধ্যে বিরাজ করে মন। চিন্ময়ীরূপী দুর্গা থেকে মৃণ্ময়ীরূপী দেবীকে নিয়ে বারোয়ারির পূজা থেকে প্রাচীন বনেদি বাড়ির দুর্গামণ্ডপে উল্লাসের মাত্রা প্রায় একইরকম। কিন্তু রীতিনীতির আড়ম্বরে বর্ধিষ্ণু পরিবারের আটচালা সেজে ওঠে একটু অন্যরকম ভাবে। ঠিক যেমনটা হয় হাওড়ার পাঁতিহালের রায়বাড়ির দুর্গাপূজায়।

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরের পাঁতিহাল গ্রামে অবস্থিত রায়বাড়ি। প্রতিভা এবং আধ্যাত্মিকতার মিশেলে সমৃদ্ধ এই গ্রাম। এই গ্রামেই ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন কবি বিষ্ণু দে। ইংরাজি অভিধানের অন্যতম স্রষ্টা এ টি দেবের পৈতৃক ভিটেও এই পাঁতিহাল গ্রামে। পাঁতিহাল গ্রামের মধ্যে দিয়ে যে প্রধান রাস্তা চলে গিয়েছে তার আদি নাম ফিটার রোড। ১৯৪৪ সালে এই রাস্তা ধরেই কবি বিষ্ণু দে'র সঙ্গে গ্রামে এসেছিলেন প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী যামিনী রায়। পাশাপাশি এই গ্রামে অবস্থান করতে দেখা যায় মা মণ্ডলা কালীকে। প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো এই মন্দির। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় পুজিত হন জাগ্রত এই দেবী।

হাওড়া জেলার প্রাচীন বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা এরকম অনেকই আছে। যদিও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্দুল দত্ত চৌধুরী জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পরিবারের দুর্গাপূজা ক্রমহ্রাসমান। বনেদিয়ানা শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূজাপার্বণের রীতি কালের সঙ্গে তলিয়ে যেতে বসেছে। সেক্ষেত্রে রায়বাড়ির বনেদিয়ানার সঙ্গে পূজাপার্বণের জাঁকজমকপূর্ণতা এখনও অক্ষুণ্ণ। এই বাড়িতে দোলযাত্রা এবং দুর্গাপূজা দুই-ই সাড়ম্বরে পালিত হয়। বর্তমানে এরকম বাড়ি প্রায় দেখাই মেলে না। তবে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ি, চোরাবাগান মিত্র বাড়িতে এখনও এই দুই উৎসব অতি সমারোহে পালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতেও এই দুই উৎসব পালিত হোত। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর লেখা 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনি ও প্রথা' বইতে লিখেছিলেন— 'হিন্দু বাড়িতে দোল এবং দুর্গোৎসব দুই করা উচিত'।

পরম্পরাকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছেন পাঁতিহালের শ্যামল, অসিত, অরুণ রায়েরা। রায়বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা চতুর্ভুজা। এই গ্রামে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে দুর্গাপূজা শুরু হয়। স্বর্গীয় বলরাম দত্তের হাত ধরে পূজা শুরু হয় বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। জনশ্রুতি, পাঁতিহালের

রায়েরা বর্ধমান রাজার অনুগ্রহ লাভ করার ফলে তাদের বংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কারণ হাওড়া জেলার এই পাঁতিহাল গ্রাম বর্ধমান রাজার জমিদারির অধীনে পড়ত। তাই দিলীপ রায়েদের পূর্বপুরুষরা রাজার তরফ থেকে রায়বাহাদুর উপাধিও লাভ করেন। পরবর্তীকালে হাঁটাল, মানসিংহপুরে থাকা বর্ধমান রাজার ৭৭৫ বিঘা জমি রাজা তাঁদের দান করেন। সেই জমি থেকে যে আয় হোত তা দিয়েই বহন করা হোত পূজার যাবতীয় খরচ। তবে বর্তমানে তা আর নেই। জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত জমিও সরকারি অধিগ্রহণ হয়েছে। বর্তমানে দেবোত্তর সম্পত্তি বলতে তিনটি পুকুর এবং বাড়ির কুলদেবতা শ্যামসুন্দর জীউর নামাঙ্কিত আরও একটি পুকুর রয়েছে।

রায়বাড়ির কুলদেবতা শ্যামসুন্দর জীউর। কষ্টি পাথরের রাধাগোবিন্দের মূর্তি থাকার কারণে অতি সমারোহে দোলউৎসব পালন করা হয়। দোলউৎসব উপলক্ষে রায়বাড়ি সংলগ্ন প্রাঙ্গণে মেলার আয়োজন প্রতিবছরই হয়ে থাকে। রায়বাড়ির কুলদেবতার ছাপ এবাড়ির দুর্গাপ্রতিমার মূর্তি এবং পূজার রীতিনীতির মধ্যেও লক্ষণীয়।

মূলত একচালার প্রতিমার জায়গায় রায়বাড়ির দুর্গা তিনচালার। চালার ডানদিকে কৃষ্ণ এবং বামদিকে রাধাকে অবস্থান করতে দেখা যায়। দেবী সিংহবাহিনীর আদলে তৈরি রায়বাড়ির চতুর্ভুজা দুর্গাপ্রতিমা। দেবী পার্বতীর চার হাতের এক হাতে খড়্গ, অন্য হাতে চক্র এবং বাকি দুই হাতে ত্রিশূল। দেবীর ডানদিকের চালার উপরে লক্ষ্মী, নীচে গণেশ এবং বাঁদিকের চালায় সরস্বতী এবং নীচে কার্তিককে অবস্থান করতে দেখা যায়। এই পূজায় কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প হইতে আশ্বিনের শুক্ল নবমী পর্যন্ত চণ্ডীপাঠ হয়। এক্ষেত্রে ১৫ রূপ চণ্ডীপাঠ হয়ে থাকে। দুর্গানাম জপ দশ হাজার, মধুসূদন নাম জপ পাঁচ শতক, জবা দান পাঁচ শতক এবং বিল্বপত্র পাঁচ শতক দান করা হয়। ১৮টি পুরাণের মধ্যে দুর্গাপূজা দেবী পুরাণ, বৃহৎ নন্দীকেশ্বর পুরাণ এবং কালিকাপুরাণোক্ত মতে হয়ে থাকে। সেইমতো রায়বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা কালিকাপুরাণোক্ত মতে পূজিত হয়। দেবী এখানে জয়দুর্গা রূপে অবস্থান করছেন। রায়বাড়ির দুর্গাপূজার সূত্র বেষ্টন হয় না। তিরকাঠির জায়গায় চারদিকে চারটি রাশ গাছ পোঁতা হয়।

এই বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজায় পূজার জোগাড়ের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এখানে পরম্পরাগতভাবে বংশের নরসুন্দররা পূজার জোগাড় করে আসছে। রাখালচন্দ্র পরামানিকের বংশধররা বর্তমানে তা করে থাকে।

রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ।

পূর্বে আরো বেশি হলেও বর্তমানে তিনমন চালের নৈবেদ্য হয়ে থাকে। নিজস্ব চণ্ডীমণ্ডপেই বংশপরম্পরায় পূজা হয়ে আসছে রায়বাড়ির। সুপ্রশস্ত এই চণ্ডীমণ্ডপেও প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীমণ্ডপের মূলফটকের বামদিকে পুরোহিতের ঘর এবং তার পাশে ঘরটি বাড়ির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। মণ্ডপের ডানদিকের ঘরটি ভাঁড়ার ঘর এবং পূজার জোগাড় এই ঘরেই হয়ে থাকে।

এই পূজায় বলিদান প্রথা চালু আছে। সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপূজা এবং নবমীতে একটি করে পাঁঠা বলি এবং কুষ্মাণ্ড বলি হয়ে থাকে। রায় বাড়ির ইতিহাসের পাতা ওলটালে আরও একটি রোমহর্ষক ঘটনা উঠে আসে। জানা যায়, বহুকাল পূর্বে পূজা শুরুর কয়েক বছর পর ইসলামপুর নিবাসী ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ দেবীর স্বপ্নাদেশ পান— আগামীকাল মণ্ডলা কালীমায়ের মন্দির সংলগ্ন পুকুরে স্নান করতে গেলে তিনি একটি খড়্গ ভাসতে দেখবেন। সেই খড়্গ উদ্ধার করে তা দিয়েই পাঁঠা বলি করতে হবে। স্বপ্নাদেশের কথামতো তিনি সেখানে যান এবং দু'টি খড়্গ ভাসতে দেখেন। তার মধ্যে একটি খড়্গ উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং তা রায় বাড়িতে রাখা রয়েছে।

আগে তা দিয়েই পাঠা বলি হোত কিন্তু সাড়ে ৩ ফুট লম্বা এবং ৫ কেজি ওজনের খড়্গ দিয়ে বর্তমানে বলি না চললেও চণ্ডীমণ্ডপে তা রেখে হালের তৈরি খড়্গ দিয়ে বলিপ্রথা সম্পন্ন হয়। এছাড়াও এই বাড়ির পূজা শুরু হওয়ার আগে কামান দাগা হোত। বর্তমানে কামান রইলেও তা আর দাগা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

অবশেষে দশমীর দিন নিরঞ্জনের পর্ব। পরিবার সূত্রে জানা যায়, দশমির দিন সাপ খেলার রীতি আছে এই বাড়িতে। এইদিন বাড়ির আট থেকে আশি এবং পুরোহিতগণ মাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। বাঁশের দোলাতেই দেবী পার্বতী নিরঞ্জনের পথে এগিয়ে চলেন। সেই সঙ্গে শুরু হয় আরও এক বছরের প্রতীক্ষা। ■

বেহালার রায়বাড়ির দুর্গা প্রতিমা।

বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো

নবকুমার ভট্টাচার্য

বারোয়ারি পুজো দেখার পাশাপাশি একবার উঁকি মেরে দেখে আসতে পারেন রাজ্যের সেইসব বনেদি বাড়ির পুজো— সেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে দেবী আরাধনা হয়ে চলেছে। বিভিন্ন বনেদি বাড়ির পুজোয় আছে কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন কলকাতার দর্জিপাড়ার মিত্র বাড়িতে ষষ্ঠির দিন কুলদেবতা রাজরাজেশ্বরকে সাক্ষী রেখে পুজো শুরু হয়। শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজোয় বলি হয় একটি মাগুর মাছ। জানবাজারে রাসমণিকুটিতে পুজো হয় শাক্ত মতে। জোড়াসাঁকোর দাঁ-বাড়ির প্রতিমায় গরান কাঠের উপর মাটির প্রলেপ পড়ে। চোরবাগানের চ্যাটার্জি বাড়িতে ষষ্ঠী থেকে ঠাকুরকে চোদ্দখানা নৈবেদ্য দেওয়া হয়। বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদের দুর্গাপুজো সম্ভবত ১০১৭ বঙ্গাব্দে রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার চৌধুরী প্রবর্তন করেন। তালপাতার প্রাচীন পুঁথি 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' অনুযায়ী এখানকার দুর্গাপুজো হয়। নদীয়ার রাজবংশের ইষ্টদেবী দুর্গা। উল্টোরথের দিনে এখানকার প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ষষ্ঠীতে এখানে বোধন হয় না। হয় তার আগের নবমীতে। বোধনেও এখানে পাঁঠাবলি হয়। কোচবিহার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোও সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। রাজা নরনারায়ণ দেবী মহামায়া কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পরিবারের দুর্গাপুজো প্রচলন করেন। এখানকার দেবীমূর্তির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। রাজবর্ণা দেবী দশভুজার ডান পা সিংহের উপর ও বাম পা মহিষের পিঠে। অসুরের ডান হাত সিংহের মুখে। বাঁ হাত বাঘের মুখে, দু'পাশে জয়া বিজয়া।

রায়গঞ্জ ও ইটাহার ব্লকের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় প্রায় ৬০ বিঘা জায়গাজুড়ে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। এলাকার মানুষের কাছে যা ভূপালপুর রাজবাড়ি নামে পরিচিত। দুর্গাপুজোর সময় এই রাজবাড়ি উৎসবের আতিশয্যে মেতে ওঠে। ঐতিহ্যের এই পুজো দেখতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত রাজবাড়িতে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় উপচে পড়ে। দশমীর দিন স্থানীয় কাতলা নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এককালে এই রাজবাড়িতে মেষ বলি হোত, ভূপালপুর রাজবাড়িতে এখন বিশেষ আকর্ষণ রচনা পুজো। রচনাপুজো হলো, আস্ত ফল যেমন নারকেল, বাতাবিলেবু, আপেল, আনারস দিয়ে যেসব ভোগ দেওয়া হয় পুজোতে, সেসবই মণ্ডপ চত্বরে একটু উঁচু জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। পাশাপাশি বড় আকারের লাড্ডু, মিষ্টিও থাকে তার মধ্যে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেসব লাফিয়ে লাফিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে খুব আনন্দ পায়। তাই

এখানকার রচনাপুজোয় ভোগের প্রতি এক বাড়তি আকর্ষণ রয়েছে।

নৈহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সরকার বাড়ির পুজোর বনেদিয়ানা আজও অটুট। ৩১৬ বছরের প্রাচীন এই পুজো বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে। নৈহাটির বরদা রোডের সরকার বাড়িতে প্রথম পুজো শুরু হয় ১৬৯৯ সালে।

এই বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'কাঁচা ভোগ' দেওয়া হয় মা'কে। অর্থাৎ ভোগ তৈরির সামগ্রী প্রথমে পুজো করা হয়। তারপর তা রান্না করা হয়। সাধক তৈলঙ্গস্বামীর স্মৃতিবিজড়িত মধ্য হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরের ভট্টাচার্যবাড়ির পুজো ৩০০ বছর অতিক্রান্ত। চিরাচরিত পারিবারিক ঐতিহ্য ও বনেদিয়ানা বজায় রেখেই পুজোর আয়োজন এখনও করে আসছেন পরিবারের সদস্যরা। আজ থেকে বহু বছর আগে পূর্বপুরুষ কাশীনাথ তর্কতীর্থের পৌত্র ভৈরবীচরণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি লাভ করেন। পরে হাওড়া জেলার আন্দুলে সেই মূর্তি স্থাপন করেন। মূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং তৈলঙ্গস্বামী। পরবর্তীকালে এই বংশেরই একটি অংশ বসবাস আরম্ভ করেন হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের উমাচরণ ভট্টাচার্য লেনে। সেই সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী মূর্তিও নিয়ে আসা হয় এই বাড়িতে। ১৬৫৬ সাল থেকে তন্ত্রমতে শুরু হয় এই পুজো। দেবীপক্ষের দিন থেকেই পুজো শুরু হয়। প্রতি বছর একই কাঠামোয় একচালার প্রতিমা তৈরি হয়। সিংহের রঙ সাদা এবং গণেশের পেটের রঙ লাল। ৩৫০ বছরের পুরনো তালপাতার পুঁথিতে লিপিবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শঙ্করীর আরাধনা হয়। বিসর্জনের দিনে বাড়ির সদস্যদের কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয় রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে। ভট্টাচার্যবাড়ির প্রতিমাই প্রথম ভাসান দেওয়া হয়। এরপর অন্যান্যদের প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে থাকে। এই রীতি এখনও চলে আসছে।

বড়িশা সাবর্ণ রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গা পূজা।

ঐতিহ্য ও পরম্পরা এক একটি পরিবারে এনে দেয় আলাদা পরিচিতি। কী কারণ বা কবে থেকে তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও পরম্পরার গতি বিঘ্নিত হয় না। এমনই এক পরিবার আসানসোলের কাছে সালানপুরের এথোড়া গ্রামের মুখোপাধ্যায় পরিবার। এই পরিবারে আজও দুর্গাপুজোর মন্ত্রোচ্চারণ ও চণ্ডীপাঠ করা হয় তালপাতার পুঁথি দেখে। বছরের একবার এই পুজোর সময়ই পারিবারিক সিন্দুকে রক্ষিত ওই দুর্মূল্য তালপাতার পুঁথিটি বের করা হয়। পাশাপাশি এবাড়ির পুজোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানকার দেবীমূর্তির মুখের সঙ্গে পুরীর জগন্নাথদেবের মিল রয়েছে। আর এ বাড়ির রীতি অষ্টমীর দিন ঠাকুর দালানে রাত জাগবেন শুধুমাত্র পরিবারের মহিলারাই। আর এ বাড়িতে অষ্টমী, নবমী ও দশমী তিনদিন ধরে সিঁদুর খেলা হয়। বালুরঘাটের বিশ্বাস পাড়ায় সাহারায় পরিবারের পুজো হয় বৈষ্ণবমতে। এই বংশের কুমুদিনী সাহা স্বপ্নাদেশ পেয়ে ১৭০ বছর আগে এই পুজো শুরু করেন। এই বাড়ির প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হলো দেবীর ডানদিকে কার্তিক ও

লক্ষ্মী এবং বাম দিকে সরস্বতী ও গণেশ রয়েছেন। এই বালুরঘাটে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত মোক্তার পাড়ার গৌরীপাল পুজোমণ্ডপ। ২৫০ বছরের এই পুজোর রীতি হলো মাছ ভাজা আর পান্তাভাতের ভোগ দেওয়া হয় মা দুর্গাকে। আবার কোচবিহারের শিবযজ্ঞ চক্রবর্তী বাড়ির পুজোর ভোগে দেওয়া হয় হাঁসের ডিম।

বিশ্বাসের কাছে হার মেনেছে মহাকাল। থমকে গিয়েছে ঘড়ির কাঁটা। যুগ পাল্টালেও এতটুকু পাল্টায়নি বীরভূম জেলার আমোদপুরের আদি জমিদার মহানন্দা দে বাড়ির দুর্গাপুজো। ভক্তের প্রতিশ্রুতি রাখতে পুজো নিতে আলতারাঙা পায়ে মা আনন্দময়ী সশরীরে আজও আসেন আমোদপুরের দে পরিবারের পুজো প্রাঙ্গণে। অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে ছড়িয়ে রাখা সিঁদুরে রেখে যান পদচিহ্ন। সেই বিশ্বাসে আজও অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে জনস্রোতে ভাসে দে বাড়ির পুজো মণ্ডপ। বর্ধমান জেলার গলসির দত্তপাড়ায় দত্তবাড়ির দুর্গাপুজো ৪৫০ বছরের প্রাচীন। ১৭ পুরুষ ধরে এই পুজো চলে আসছে। এই বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এখনও অষ্টমীতে দেবীকে ২২ কেজির অন্নভোগ দেওয়া হয়। ওই জেলারই দুর্গাপুরের কাঁকসার মালানদিঘি গ্রামে পালকিতে চেপে কলাবউ আসে মুখোপাধ্যায় বাড়িতে। দুর্গাপুরের খনি অঞ্চলের পারিবারিক পুজোর এক সেরা আকর্ষণ হলো সরপিগ্রামে রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো। ২৭৫ বছর ধরে এই পুজো চলে আসছে। পুজোর বিশেষত্ব হলো বোধন। ছাগবলির মধ্য দিয়ে বোধন শুরু হয় কৃষ্ণনবমীর দিন। বর্ধমান জেলার প্রাচীন বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির বুড়িমার দুর্গাপুজো। মেমারি থানার ন'বস্থা দু'নম্বর অঞ্চলের ভৈটা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজো প্রায় ৩৫০ বছরের প্রাচীন। এই বাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট্য সিংহবাহিনী মা দুর্গা সপরিবারে সপ্তমী থেকে দশমী প্রতিদিন নতুন বস্ত্রে সজ্জিতা হন। আর অষ্টমীর সন্ধি পুজোতে বিশেষ উপাচার হিসেবে থাকে পাকাকলার বড়া। এছাড়াও নবমীতে মায়ের অন্নভোগের সঙ্গে ব্যঞ্জন হিসেবে থাকে মোচা। কালো কচু এবং চালকুমড়োর তরকারি। দশমীতে হয় এই বাড়িতে কুমারী পুজো। এই বর্ধমান জেলারই জামালপুরের কোলসড়াগ্রমের ঘোষালবাড়ির দুর্গাপুজোতেও দশমীর দিন ১১টি বালিকাকে কুমারীরূপে পুজো করা হয়।

প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো হয় কোচবিহারের ধর্মতলার ভট্টাচার্য বাড়িতে। বংশ পরম্পরায় ২১ পুরুষ ধরে চলে আসছে এই পুজো। প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত বাড়িতে ঘটপুজো হয়। আর এই ছ'দিনই নিরামিষ ভোগ হয়। বাড়ির সকলেই এই ক'দিন পুজোর নিরামিষ ভোগ খান। এরপর ষষ্ঠীর দিন বোধন হয়। সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন একটি করে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সন্ধি পুজোর সময়ও একটি পাঁঠা বলি হয়। নবমীর দিন দুটো পাঁঠা ও একটি চালকুমড়ো বলি। এছাড়া সপ্তমী অষ্টমী নবমী এই তিনদিনই মায়ের কাছে বাল্যভোগ দেওয়া হয়। বাল্যভোগে নানা ধরনের শাক সবজি, ডালনা, পায়েশ, বড়া ইত্যাদি থাকলেও খিচুড়ি এবং বোয়াল মাছ কিংবা পুঁটি মাছ ভাজা কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে। স্বপ্নে দেখা মায়ের আদেশ অনুসারেই বাড়িতে মন্দির ও অতসীফুলের রঙের ডাকের সাজে মায়ের একচালা মূর্তি বানিয়ে পুজো চলছে ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজো। কোচবিহার শহরের ব্রজমাতা দিঘির সংলগ্ন এই ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজোর বিশেষত্ব হলো পঞ্চমীর সকালে বাড়ির মন্দিরে আগে মনসা পুজো করা হয়।

জমিদারি না থাকলেও পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরের পুরনো মালুঞ্চার দত্তবাড়ির পুজো আজও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে চলে আসছে। এই পুজো ১৬০ বছর অতিক্রান্ত। এই পুজোয় দশমীর দিন বিকেলে একটি চালকুমড়োকে তিরবিদ্ধ করার পরই বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের হয়। পাঁচ পুরুষ ধরে এই প্রথা চলে আসছে। শান্তিপুরের চাঁদুনিবাড়ির 'উমা' যেন আরও বেশি ঘরের মেয়ে এবং অনেক বেশি বাঙালি। দশমীতে তাই দেবীর ভোগে মুখ্য এবং আবশ্যিক উপাচার পান্তাভাত ও ইলিশমাছের টক। তার সঙ্গে সঙ্গে ন'রকম ভাজা। তরকারি, পায়েস ইত্যাদি। তিনি কেবল সন্তানদের সঙ্গে ভোগ গ্রহণ করেন না, কৈলাশে রওনা হওয়ার সময় তা নিয়েও যান দেবাদিদেবের জন্য।

কালনার লক্ষ্মণপাড়ার ভট্টাচার্য বাড়ির পুজোয় এখনও পুজোয় কলাথোড়ের নৈবেদ্য এবং মশালের আলোয় দেবীর নিরঞ্জন হয়ে থাকে। কালনার মুখার্জী পরিবারের জয়দুর্গাদেবীর পুজোয় ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী থাকলেও দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশ অনুপস্থিত। পাটুলির চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দশভুজা দুর্গার দুটি হাত বড় যা প্রকাশ্যে দৃশ্য আর অবশিষ্ট আটটি হাত এতই ছোট যে তা সচরাচর দেখা যায় না।

বঙ্গে দুর্গোৎসবে রীতি নীতি আচার নিয়মে এত বৈচিত্র্য রয়েছে যা অন্য কোনো পুজোয় দেখা যায় না। ∎

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন

চিঠিপত্র

শুধুই ঝান্ডা বদল

নিজের খোঁড়া গর্তে বামফ্রন্ট ডুবেছে। মানুষকে মানুষ না ভাবা। পুলিশকে দলদাস বানানো। মিডিয়াকে কেনা। সাংবাদিক পেটানো। বিরোধী দলকে আমল না দেওয়া। মিথ্যা কেসে ফাঁসানো। অভিযোগকে কুৎসা বলা। গুন্ডাকে ক্যাডারবাহিনী বানানো। জনতাকে হাতের পুতুল ভাবা। রাজ্যকে পৈতৃক সম্পত্তি গণ্য করা। সরকারি কর্মচারীদের কেনা গোলাম ভাবা। সর্বোপরি নিজেদেরকে জন্মমৃত্যুর ঊর্ধ্বে ভাবা। ইত্যাদি আরো কত কী! অতসব এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। পাঠক পাঠিকা স্বয়ং সম্পূর্ণতা দিবেন। বর্তমান পরিবর্তনের সরকার বিগত বাম সরকারকে টুকলি করে চলেছে। তবে বামেরা ছিলেন একটু পুরোনো, আর এখনকার তৃণমূলীরা এই টোকাটুকিতে বেশ আধুনিক। তাই ৩৪ বছরে বামেরা যত ঋণ করেছে, এরা ৪ বছরে গড়ে তাদের ছাপিয়ে গেছে। দলদাস তৈরিকরণে মমতাদেবী একশোতে ১১০ নম্বর পাবেন। পুলিশকে ক্যাডার বানিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি কেড়েছেন, শিল্পীর তুলিতে নীল-সাদা রং লাগিয়েছেন, কবির কলম কেড়ে নিয়েছেন। অভিনেতাদের নেতা বানিয়ে ছেড়েছেন। তাঁবেদারি, তার রাজত্বের একমাত্র সম্মান, পুরস্কার, সুস্থ জীবন পাওয়ার পথ। তাই দলে দলে তাঁবেদারির রথের সওয়ারিরা মমতাদেবীর পদলেহন করছে। চিরকাল মেরুদণ্ডহীন আর বিবেকবোধহীন মানুষের ভিড় বেশি সমাজে।

যে পথে বামেরা ডুবেছে সেই পথই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবলম্বন করেছেন। বামেরা যা যা পদ্ধতি বিরোধী শক্তিকে রোখার জন্য ব্যবহার করেছিল, সেগুলিই তৃণমূল শান দিয়ে ব্যবহার করছে। মমতাদেবীর লড়াইটা দেখিয়ে দেবার, বাংলা বাঁচানোর নয়। জনতার সবাই কিন্তু তাঁবেদারি, প্রবঞ্চক, পদলেহনকারী নয়। সবাই মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েনি। যারা তৃণমূলে গেছে, তারাই সুখে আছে— এমন জীবনাদর্শে সবাই বিশ্বাসী নয়। তাদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয় কিন্তু। এরাই পরিবর্তনের দাবিদার। যারা আজ মমতার ঝান্ডা নিয়ে বাংলা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তারাই লালঝান্ডা নিয়ে কেশপুর, ধানতলা, বানতলা বানিয়েছিল। অর্থাৎ অত্যাচার ও অত্যাচারী একই স্থানে রয়ে গেছে। শুধু রং বদলিয়েছে। সাধারণ পরিবর্তনকামী মানুষের পরিবর্তন হয়নি। তাই, বামফ্রন্ট নামক জগদ্দল পাথরকে যখন জনতা ঝেটিয়ে বিদায় করতে পেরেছে, স্বল্পায়ুর সুবিধাবাদী পরিবেষ্টিত তৃণমূলকে উৎখাত করতে খুব বেশি সময় লাগবে না বলেই মনে হয়।

—**বরুণ মণ্ডল,**
রাণাঘাট।

সংখ্যালঘু শুধু মুসলমানরাই?

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি মদতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটিস ডেভালপমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স করপোরেশন' নানা স্কীম এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পারসিক, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যালঘু উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। যেমন— টার্গেট গ্রুপ, টার্মলোন স্কীম, মাইক্রোফিন্যান্স ডাইরেক্ট টু সেলফ হেলথ গ্রুপস, মাইনরিটি ওমেন এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম, এডুকেশন লোন, মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ, পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ (সি এস), পোস্ট ম্যাট্রিক স্টাইপেন্ড (আন্ডার ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম), প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম, কোচিং ফর এমপ্লয়মেন্ট ইত্যাদি। কিন্তু হাজি মহম্মদ মহসীন এনডোমেন্ট ফান্ড স্কলারশিপ'-এ দশম শ্রেণীর ১০০ জন মুসলমান ছাত্রছাত্রী, মাধ্যমিকের ৭০ জন মুসলমান ছাত্রছাত্রী, হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার ২০ জন মুসলমান ছাত্রছাত্রী, সিনিয়র মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষা দেওয়া ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে মেধাভিত্তিক ২০ হাজার টাকা পাইয়ে দেওয়ায়, কোচিং ফর এমপ্লয়মেন্ট প্রকল্পে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের চাকরির পরীক্ষায় বসার উপযুক্ত করার জন্য মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের ফ্রী কোচিং-য়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ায়, 'রোকেয়া শেখ্ওয়াত্ গ্যাসওভেন মাইক্রো-ক্রেডিট স্কীম' থেকেও মুসলমানদের নানাভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ায় তোষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন খুব সহজেই মানুষের মনে জেগে ওঠে— বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক, শিখ, খৃষ্টান ইত্যাদি সমাজ বিশেষ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কেন? বিশেষভাবে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিতে শুধু মুসলমানদেরই বিশেষ কিছু সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন?

পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশ মুসলমান। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা কখনই সংখ্যালঘু নয়। পশ্চিমবঙ্গের সত্যিকারের সংখ্যালঘু হলো বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক, শিখ, খৃষ্টান সমাজ। অথচ তাদের সম্প্রদায়ের মহান ব্যক্তিদের নামে স্কীম, তাদের ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার স্কীম, তাদের মেধা ভিত্তিক সুবিধা পাবার কোনো স্কীম-এর কথা প্রকল্পগুলিতে উল্লেখ নেই।

সত্যিকারের সংখ্যালঘুদের হেয় করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা করছে আসলে তা হলো তোষণ। অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী দ্বিচারিতা বন্ধ হোক। ভোট লোলুপতাময় এই ঘৃণ্য তোষণমূলক কাজের ফলে ভারতবিদ্বেষী জিহাদি তৈরি হচ্ছে। এ কাজ দেশপ্রেম জাগাচ্ছে না, বরং মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে। যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

—**অমিত ঘোষ দস্তিদার,**
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

প্রবীণ নাগরিকদের কিছু কথা, কিছু ব্যথা

এন. সি. দে

প্রতি বছর নিয়ম করে 'বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস'টি আসে আবার নির্বিঘ্নে চলেও যায়। কারণ এদেশের প্রবীণ নাগরিকগণ সচেতন নয়, সঙ্ঘবদ্ধ নয়, সংগঠিত তো নয়ই। কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী রাজ্যসরকার—এই অসংগঠিত বিপুল প্রবীণ নাগরিক সমাজকে তাই গ্রাহ্যই করে না। সরকারি অফিস, আদালত কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে অবসরপ্রাপ্ত পেনশন ভোগী নিশ্চিন্ত জীবনের অধিকারী--- প্রবীণ নাগরিকগণ পাড়ায়-পাড়ায় প্রভাতী কিংবা সান্ধ্য মজলিশ ক্লাব গড়েন শুধু নিজেদের আনন্দে মত্ত রাখতে। তাদের কারো নিরাপত্তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি আইন ২০০৭ সালে পাশ হলেও আজ পর্যন্ত এই আইনে সন্নিবিষ্ট বিধান অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিগুলি পালন না করেও সরকার পার পেয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও সরকারের এই নিস্পৃহতার বলি হচ্ছেন ঘরে ঘরে বন্দী অসহায় চলচ্ছশক্তিহীন একক জীবনে বাধ্য অসংখ্য বার্ধক্যপীড়িত মানুষ। সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হয় তাদের বিনা চিকিৎসায় মৃত পচাগলা মৃতদেহের কাহিনি। এই নির্দয়-নিষ্ঠুর সমাজের জন্য দায়ী কে বা কারা?

ভারতীয় সমাজ একদিন সারা বিশ্বে সমাদৃত ছিল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে এসে এদেশের জনগণের প্রতিরোধের মুখে যতটা পড়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল এদেশের সমাজ ব্যবস্থার। ইংরেজ তাই এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে চালু করেছিল 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ' যা সমাজবদ্ধ জীবনের পরিপন্থী। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল 'পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট'। ভূমি- সম্পর্কের জটিল অঙ্কে গ্রাম্য-জীবনে শুরু হলো দুর্ভিক্ষ, অনাহার আর উৎখাত হওয়া। এতদিনের 'প্রজাপালক' রাজা ও জমিদার পরিণত হলো প্রজাপীড়ক শাসকে। এই প্রজাপীড়নের ধারা ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের পর আরও তীব্র হয়। শুরু হয় 'আর্থিক বিশ্বায়নের নামে ভারতীয় অর্থনীতির পাশ্চাত্যকরণ। ভারতীয় শিল্প কারখানা ও শ্রম আইন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গালভরা 'আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি'। দেশের শেয়ার বাজারের মতো দেশের সমাজও আজ অশান্ত ও অস্থির। স্থায়ী, নিশ্চিন্ত, সংগঠিত চাকুরিজীবীরা আজ ক্রমশ অস্থায়ী, অসংগঠিত ও অনিশ্চিত শিল্পশ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। দেশের পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টেই একথা স্বীকৃত।

বিশ্বায়ন হচ্ছে শুধু অর্থনীতিতে অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিপতিদের ব্যবসার স্বার্থে। সামাজিক বিশ্বায়ন কিন্তু হচ্ছে না। সমাজ পড়ে রইল সেই আদিম স্তরে। সংসারের তরুণ প্রজন্ম পেটের দায়ে আজ পরবাসী। পড়ে রইল অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতা। ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে সারাদেশে প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪০ জন। লোকসভার এক হিসাবে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালের পয়লা মার্চে এই সংখ্যা হতে পারে সারাদেশে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ৯৯ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৯৩ লক্ষ ৪৬ হাজারে। এই সংখ্যা সারা বিশ্বেই এত দ্রুত হারে বাড়ছে যে বিশেষজ্ঞগণের মতে সারা বিশ্ব যেন আজ বার্ধক্যে পরিণত হতে চলেছে। তাঁদের মতে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ১৫ বছর বয়স্কদের সংখ্যাকেও ছাপিয়ে যাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রবীণ নাগরিকদের স্বার্থকে উপেক্ষা করার অর্থ হবে বিশ্ব-জনসংখ্যার ২০ শতাংশকে উপেক্ষা করা।

আজকের জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বলাই যায় যে সারা ভারতে আজ প্রায় দু' কোটি প্রবীণ মানুষ একক জীবন-যাপন করছে। এর মধ্যে ৪ ভাগের ৩ ভাগই মহিলা। ২০১১ সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়ী, প্রতি ১০০০ বয়স্ক পুরুষের মধ্যে ৬৫, ৭০, ৭৫ এবং ৮০ বছর বয়স্কা মহিলাদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৩১০, ১৫৯০, ১৭৫৮ ও ১৯৮০ জন। প্রতি ৭ জন বয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন এমন পরিবারে বাস করেন যেখানে কারও বয়সই ৬০-এর নীচে নয়। গ্রাম্য জীবনে প্রবীণ নাগরিকদের অবস্থা আরও করুণ। গ্রামাঞ্চলে ২৮-৩০ লক্ষ প্রবীণা মহিলা একক জীবনযাপন করছেন, আর শহরাঞ্চলে এই সংখ্যা ৮-১০ লক্ষ। ভারতীয় কৃষি বছরের পর বছর অবহেলিত হওয়ায়, গ্রামাঞ্চলের কৃষক-পরিবার নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরে হয় ভিখারি, নয়তো নিম্নমানের সামাজিক সুরক্ষাহীন মজুরে পরিণত হচ্ছে। আর গ্রামের ঘরে পড়ে আছে কেবল তাঁদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, চিকিৎসাহীন অবস্থায়। শহরের বিত্তহীন আর বিত্তবান সহ প্রবীণ-প্রবীণাদের অবস্থাও তথৈবচ। বিশ্বায়নের অবিশ্বাসে শিল্পহীন, কর্মহীন সন্তানরা কর্মের খোঁজে শহর থেকে শহরে, রাজ্য থেকে রাজ্যে, দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছে। তাদের অসহায়, অশক্ত পিতামাতা সকলের অলক্ষ্যে মৃত্যু মিছিলে পাড়ি দেয়। আমাদের সমাজের দুর্বলতম অংশকে রক্ষা করাটা রাষ্ট্রের কর্তব্য। আসুন সরকারগুলিকে সেই কর্তব্য পালন করতে বাধ্য করি।

১। গৃহবন্দী একাকী বসবাসকারী বয়স্ক মানুষদের প্রতিটি গৃহ চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের হেলপলাইন-এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যাতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

২। 'মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট-২০০৭' শুধু লোক দেখানোর জন্য নয়, প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করতে হবে।

৩। 'সিনিয়র সিটিজেন্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' গঠন করতে হবে।

৪। সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য যেমন 'ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ' আছে, তেমনই 'ন্যাশনাল কমিশন ফর সিনিয়র সিটিজেন্স' গঠন করতে হবে।

(লেখক 'প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ অব বেঙ্গল'-এর সম্পাদক)

দুর্গাপূজা—একাল ও সেকালের ভাবনা

শ্রীতনু কুমার রায়

দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দু সমাজে একটি সাংবাৎসরিক নন্দিত উৎসব। হিন্দুদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসবকে পূজা না বলে দুর্গামহোৎসব বললেই সঠিক বলা হবে। দুর্গাপূজা মূলত হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এতে জড়িত আছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষ। ব্রাহ্মণ পুরোহিত থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, চারুশিল্পী, কারুশিল্পী, মালী, কুম্ভকার, মৃৎশিল্পী, তন্তুবায়, নরসুন্দর, সভাসুন্দর ঋষিদাস, ঢাকি, মালাকার, রূপদক্ষ শিল্পী, জোগানদার থেকে দোকানদার সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা ও মিলনের প্রয়োজন হয় দুর্গাপূজায়। দুর্গাপূজা মিলনের সেতুবন্ধ। দেশ ও জাতির সংহতি সাধনার ইঙ্গিতবাহী।

দুর্গাপূজার সঙ্গে আমাদের অর্থনীতিরও অনেকটা সম্পর্ক আছে। নগরে বন্দরে, গ্রামেগঞ্জে সর্বত্রই পূজার প্রস্তুতি। ঢাকি নতুন বায়নার আশায় তার ঢাক ধুয়ে মুছে রাখে। দোকানি নতুন করে মাল তুলে দোকান সাজায়। গৃহস্থ গাছের ফলগুলি সংরক্ষণ করে পূজাতে বেশি দামের আশায়। কাপড় বিক্রেতাদের তো কথাই নেই। প্রতিমাকার, মালাকার, ডেকরেটর, আলোকসজ্জা বিন্যাসী, কারুশিল্পী, ফুলওয়ালা বাঁশিওয়ালা থেকে কাঁসিওয়ালা সবাই থাকে বাড়তি উপার্জনের প্রতীক্ষায়। কেউ কেউ বের হয়ে পড়ে এঁটেল মাটি, যুগল বেল অশোক ও পদ্মফুলের সন্ধানে। তাছাড়াও সংগ্রহ করতে হয় পঞ্চশস্য--- যব, গম, মুগ, তিল, ধান। প্রয়োজন হয় পঞ্চরত্ন— স্বর্ণ, হীরক, মুক্তা, প্রবাল, পদ্মরাগ। প্রয়োজন হয় পঞ্চকষায়— জাম, শিমুল, বেড়ালা, বকুল, কুল ইত্যাদি। লাগে সর্বোষধি জল, সপ্তসিন্ধুর জল, গঙ্গোদক, ঝরণার জল, কুয়াশার জল। এছাড়াও মহাস্নানে প্রয়োজন হয় তিল তৈল, বিষ্ণুতৈল, হরিদ্রা, পঞ্চামৃত, ইক্ষুজল, বরাহদন্ত মৃত্তিকা, চতুস্পথ মৃত্তিকা, রাজদ্বার মৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, নদীর উভয়কূল মৃত্তিকা, পর্বত মৃত্তিকা, নারকেলের জল, পদ্মরেণু মিশ্রিত জল, কর্পূর, অগুরুজল, কুমকুম, বৃষ্টির জল, ফলোদক। নবপত্রিকায় প্রয়োজন হয় কলাগাছ, কচুগাছ, হরিদ্রাগাছ, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক ও মানকচু, ধানের চারা ইত্যাদি। ফুল, দুর্বা, বিল্বপত্র তো লাগেই। এক কথায় দেশে উৎপন্ন প্রায় সব কিছুই লাগে দুর্গাপূজায়। সমগ্র দেশ তথা বিশ্ববিস্তারী দৃষ্টি দুর্গাপূজায় জাগ্রত হয়। তাই দুর্গাপূজাকে 'কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ' বলা হয়ে থাকে।

দুর্গাপূজার উপর কিছু লিখতে গেলেই মনের পাতায় ভেসে উঠে শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলো। পলাশ ঢাকা কোকিল ডাকা এক নিভৃত পল্লী-সন্তান আমি। সেখানে ছিল না আলোর রোশনাই। সর্বত্র বিরাজ করত নিবিড় অন্ধকার। দুর্ভিক্ষে না মরেও আমরা মারী নিয়ে ঘর করেছি।

ঝিল্লিমুখর স্তব্ধপল্লী, বাঁশবনে কানা কুয়োর ডাক, সুপারি বাগানে বাদুড়ের ডানা ঝাপটা, জোনাকির মিটিমিটি আলো আর মশার ভন ভন শব্দ। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াচ খুব কমই লেগেছে পল্লী জীবনে। দারিদ্র্য জর্জর মানুষের জীবন সেখানে অনেকটা, ''নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে মানবেরে নাহি দেয় দোষ।''

তবে আশ্বিনের নদী-জপ-মালা-ধৃত-প্রান্তরে যেন শুনা যেত আনন্দময়ীর আগমনের বার্তা। হৃদয় নেচে উঠত ময়ূরের মতো।

আশ্বিনের শিশির সিক্ত শারদ প্রভাতে, শিউলি ঝরা রাতে, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় সর্বত্রই যেন অসুরনাশিনী, জগজ্জননী আনন্দময়ী মায়ের আগমনী বার্তা। সকল অন্যায় অসত্যকে পদদলিত করে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মায়ের আগমন। এই শিক্ষাই তো দুর্গাপূজার শিক্ষা। সবুজ শৈশবে অবুঝ মনে আমরা কিন্তু এত সব বুঝতাম না। শুধু বুঝতাম পূজা এলেই নতুন জামা, নতুন মুড়ি মুড়কি খাবার, পূজাবাড়িতে প্রসাদ পাওয়া, ঢাকের তালে তালে আরতি উপভোগ, প্রতিমা নিরঞ্জন, বিজয়ার পর ছোট বড় সবাই মিলে প্রীতি বিনিময়। পূজার প্রাক্কালে গ্রামে পূজাবাড়ির কর্তাকে দেখেছি সবিনয়ে গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানাতেন প্রতিমা দর্শন ও পান প্রসাদ খাওয়ার জন্যে। পান প্রসাদ বলতে খিচুড়ি, মিষ্টান্ন, লুচি, মণ্ডা, সন্দেশ, নাড়ু ও আরো কত কী ফলার। যেন রসের তৃপ্তি রসনায়। ভোজনের সময় পূজাবাড়ির কর্তা দাঁড়িয়ে করজোড়ে সবাইকে আপ্যায়ন করতেন। এতে ছিল না কোনো বড়-ছোট, কুলীন-অকুলীনের পার্থক্য। সবাই মায়ের সন্তান, মায়ের টানেই এসেছে সবাই।

সেকালে দুর্গাপূজায় আনন্দের খোরাকও কম ছিল না। কবিগান, পালাগান, লীলা কীর্তন, দুর্গাপুরাণের পাঁচালি ও যাত্রাগানের অভাব ছিল না। বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার ব্যবস্থা ছিল না জ্বলত ঝাড়বাতি ও হ্যাজাক লাইট। সামন্ত যুগ শেষ, তাই আজ বিত্তবান বা ব্যক্তি উদ্যোগে পূজার সংখ্যা কমে গেছে। দেশে বিত্তবানের অভাব নেই কিন্তু পূজার ব্যাপারে সদাশয় ব্যক্তির অভাব দেখা দিয়েছে— হেথায় এসেছে নতুন লোক, হেথায় নব নব রঙ্গ। আজ ব্যক্তির পরিবর্তে দেখা দিয়েছে গণদেবতা, যার সুলভ নাম 'সর্বজনীন দুর্গাপূজা।' পাড়ায় পাড়ায়, নগরে বন্দরে সর্বত্রই চলেছে বারোয়ারি পূজার ব্যাপক প্রচলন। বারো ইয়ারে (বন্ধুতে) মিলে অর্থাৎ বারো (অনেক) জনের চাঁদা নিয়ে ওই অনুষ্ঠান চলছে। আগেকার দিনে ভক্তদের বাহুতে শক্তি ছিল না কিন্তু হৃদয়ে ভক্তি ছিল অপরিসীম। এখন হৃদয়ে ভক্তি না থাকলেও পেশীশক্তির প্রাধান্য সর্বত্র।

আমাদের ছোটবেলায় দেবীপক্ষে মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম। শহরে, গ্রামে সর্বত্র এই চণ্ডীপাঠ জনপ্রিয় ছিল। এটা আকাশবাণীরই অবদান। এখন পূজাবাড়ি বিশেষ করে বারোয়ারি দুর্গাপূজাতে চণ্ডীপাঠ খুব একটা শোনা যায় না। ঢাক ও কাঁসর বাজনা বনেদি বাড়ি কিংবা মন্দির আখড়া ছাড়া খুব একটা কানে আসে না। এখনকার বারোয়ারি পূজাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'সাউন্ডবক্স' ও 'মাইক্রোফোনে'র ব্যবস্থা করা হয়। এতে চণ্ডীপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, অতুলপ্রসাদ কিংবা রজনীকান্তের গান তেমন বাজানো হয় না। পরিবর্তে বাজানো হয় হিন্দি সিডি, যেমন Just new songs, Evergreen Hits, Bollywood Top list ও দলের মেহেদি বা হানি সিংয়ের চড়া সুরের গানে। সানাইয়ের সুমধুর তান কোনো পূজাবাড়িতে আর শোনা যায় না। কোনো কোনো স্থানে রাজনৈতিক নেতার ভাষণ বাজানো হয়। স্বপছন্দ দলের মুখপত্র দৈনিক সংবাদপত্রও কোনো পূজা মণ্ডপের কাছেই দেয়ালে নজরকাড়া স্থানে টাঙানো হয়। পূজাবাড়িতে মায়ের প্রসাদ পাওয়া অকল্পনীয় ব্যাপার। আয়োজকদের উদ্যোগেই পূজা প্যান্ডেলের আশপাশে শোভা পায় নজর ও মনকাড়া স্ন্যাক্সের দোকান। সে সঙ্গে আছে ফাস্টফুডের দোকান। সেগুলোতে স্বেচ্ছায় স্বখরচে, সপরিবারে, রসনাতৃপ্তির জন্যে আছে ফুচকা, এগরোল, চাউমিন, মোগলাই পরোটা, চিকেন পকোড়া, চিকেন চাপ, পিৎজা, স্যান্ডউইচ, বার্গার, ফিস ফিঙ্গার, ফিসফ্রাই আরও কত কী! আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি পূজার ক'দিন প্রায় বাড়িতেই মুগডালের খিচুড়ি ও লাবড়ার ব্যবস্থা করা হোত। এর সঙ্গে গন্ধরাজ লেবু চিপে নিলে অপূর্ব লাগতো। কিন্তু আজকালকার যুগে অনেক পরিবারকেই দেখি পূজার ক'টাদিন হোটেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে মাটন বিরিয়ানি দিয়ে আত্মতৃপ্তি করতে হয়। এতে নাকি স্ট্যাটাস বাড়ে। অবশ্য বেশিরভাগ লোকেই পূজার দিনে নিরামিষের ব্যবস্থা করে।

আগেকার দিনে পিতৃগৃহে প্রত্যাগত পার্বতীর সঙ্গে পূজাপলক্ষে বাঙালি বধূর মনপ্রাণ আনচান করত 'বাপের বাড়ি আসার জন্যে। এখনকার বধূরা কিন্তু বাপের বাড়ি আসার জন্যে উৎসুক নয়। তারা আগে থেকেই 'ট্যুর' প্রোগ্রাম ঠিক করে রাখেন। আগে থেকে রিজার্ভেশন টিকিট সংগ্রহের জন্যে গৃহকর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তাদের ডেস্টিনেশন হয়তো দীর্ঘ নয়, হয়তো দার্জিলিং গিয়ে 'ট্রয় ট্রেনে চড়া, কিংবা দক্ষিণ বা উত্তর ভারত। আর কাশ্মীর হলে তো কথাই নয়। বাড়ি পাহারায় থাকেন বুড়ো শ্বশুর শাশুড়ি। অবশ্য বনেদি পরিবারগুলোতে এখনও পূজার সময় বছরে একবার হলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আত্মীয় স্বজনদের 'গেট টুগেদার'-এর রেওয়াজ চালু আছে। এতে সবাই প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে পরস্পর মিলিত হয়। বাড়ে হৃদ্যতা, মনের প্রসারতা ও আন্তরিকতা। পূজার ক'দিন বাড়িতে রচিত হয় এক মিলন তীর্থ। শুচিশুদ্ধ মনে পবিত্র বসনে সবাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে পূজামন্দিরে মায়ের আশিস প্রার্থী হয়ে। তবে আজকালকার টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় পূজার ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এখন বলা হয় পূজা মানে খাওয়া দাওয়া, ভাল কাপড় পরা, পূজা মানে বেড়াতে যাওয়া, পূজা মানে আড্ডা দেওয়া।

দেবীপক্ষের সকালে কাঁচা রোদে শিশির ঝলমল করতে দেখে আমাদের মা-কাকিমারা বলতেন— পূজা এসে গেছে। চারদিকেই যেন পূজাপূজা লাগছে। ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে। ছেলে- মেয়েদের নতুন জামা জুতো দিতে হবে। যে মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে আছে তার আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সবাই একাত্ম হয়ে চলতে হবে। তখন শ্রমিক, কৃষক, গৃহস্থ থেকে বুদ্ধিজীবী ও বিত্তবান সবাই পূজাকে সানন্দে আহ্বান জানাতেন। বর্তমানে কিন্তু পূজা এলেই অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। অফিসের বড়বাবুরও শান্তি নেই। মনে একই

চিন্তা এই বুঝি তার অফিসের সহকারী কেউ বেশি দামি শাড়ি নিয়ে এল। তখন নিজের গিন্নির কাছে বড়বাবুর আর মুখ থাকবে না। 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে'— কবির এই বাণী আর তাকে আশ্বস্ত করতে পারছে না।

আমরা দেখেছি পূজাবাড়িতে কলাগাছের গোড়ায় মঙ্গল ঘট বসিয়ে তার উপর ডাব স্থাপন করে মাঙ্গলিক চিহ্ন আঁকা হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে সুতো বেঁধে তাতে আম্রপল্লব, বিভিন্ন ফল ও কৃষিজ দ্রব্য ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব সাধারণ সাজসজ্জা, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ। লেখক যাযাবর ঠিকই বলেছেন, 'সহজ হওয়ার মাঝে আছে কালচারের পরিচয়, আড়ম্বরের মাঝে আছে দম্ভের।' তবে এখনকার সাজসজ্জা যুগোপযোগী ও ভিন্ন মাত্রিক। এতে ফুটিয়ে তোলা হয় ডুবন্ত টাইটানিক, কারগিল যুদ্ধ, টুইন-টাওয়ারের বিধ্বস্ত রূপ, তাজমহল, মারাদোনার ফুটবল খেলা, ব্যাটবল হাতে শচীন, সৌরভ, বিদ্যাসাগর সেতু কিংবা নিক্কোপার্ক বা সায়েন্স সিটির মতো দৃশ্যাবলী। তবে প্যান্ডেল তৈরির ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি হয়েছে। এতে ফুটে ওঠে শিল্পীর কর্মকুশলতা ও শৈল্পিক অভিব্যক্তি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেগুলো বিভিন্ন মন্দির যেমন--- বেলুড়মঠ, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি, স্বর্ণমন্দির, কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, বৈষ্ণবী দেবীর মন্দির, তিরুপতি মন্দির, বক্রেশ্বর মন্দির ইত্যাদির আদলে গড়ে তোলা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন রাজবাড়ি ও স্থাপত্যের সঙ্গে মিল রেখেও প্যান্ডেল করা হয়। দেশি-বিদেশি সকল দর্শক এসকল প্যান্ডেল দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যায়। দেখলে ভ্রম হয় কোনটা আসল কোনটা নকল। তাছাড়া মানুষ দিয়ে ডামি তৈরি করে প্যান্ডেলের সামনে রাখা হয়, যা দর্শকদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তোলে।

দুর্গাপূজার অন্যতম আকর্ষণ মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ। আমাদের সময়ে দেখেছি সকাল সকাল স্নান সেরে ছেলেরা ধুতি, পাঞ্জাবি এবং উঠতি বয়সের মেয়েরা মা কাকিমার বেনারসী কিংবা লাল পেড়ে গরদ পরে চুল ছেড়ে আলতা পায়ে কপালে কুমকুমের টিপ দিয়ে মায়ের মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াত অঞ্জলি দেওয়ার অভিপ্রায়ে। এ দৃশ্য অনিন্দ্যসুন্দর। মনে হোত 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার'। পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে যখন আমরা চণ্ডীমন্ত্র উচ্চারণ করে বলতাম, 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো দেহি।' তখন মন যেন নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে অন্যজগতে চলে যেত। এরপরই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে হাত পেতে নিতাম মহাস্নানের জল ও মায়ের মহাপ্রসাদ। উপোশ ভাঙা হোত এমনি ভাবে। 'ভাবি হায় আর কি কোথাও ফিরে পাব এ জীবন'! কিন্তু আজকের দিনে অঞ্জলির পর্বটি ভিন্নরূপধর্মী। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেকেই (অবশ্য সবাই নয়) জিন্‌সের প্যান্ট আর ছোট জামা অথবা গেঞ্জি পরে অঞ্জলি দিতে আসে। মনে ভক্তি ও একাগ্রতা মনেই থাকে, কিন্তু গড় হয়ে প্রণাম করতে গেলেই বাদ সাধে টাইট প্যান্ট শার্ট। যুগের কী পরিবর্তন! জানি না আগামী প্রজন্ম পূজাকে কীভাবে গ্রহণ করবে।

বৃটিশ ভারতে দুর্গাপূজার একটা স্বতন্ত্ররূপ ছিল। এর পেছনে ছিল একটা বিশেষ তত্ত্ব। তখন দুর্গাপূজা একটা সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে সর্বত্র। সেটা ছিল ১৮৮২ সন। বঙ্কিমচন্দ্র দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাকে নিরীক্ষণ করেছিলেন শত্রুদলনী মাতৃকা রূপে তাঁর আনন্দমঠে। এই রূপ কল্পনায় প্রভাবিত হয়েছিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা দুর্গা ও কালীকে দেশ ও শক্তির প্রতীক হিসাবে বরণ করেন। কাজি নজরুল গান রচনা করেছিলেন— 'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলা মূর্তি আড়াল। স্বর্গ যে তোর জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।' পরাধীন ভারতে পূজামণ্ডপগুলি হয়ে উঠেছিল সামাজিক মিলন ক্ষেত্র। এই আদর্শ থেকে ১৯২৪ সালে প্রথম শুরু হয় বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গোৎসব নদীয়ার গুপ্তিপাড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় চারদিকে অন্যায়, অবিচার, শোষণে মা আজ ক্ষতবিক্ষতা, 'কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা।' তাই সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে দূর করতে হবে সকল হতাশা সঙ্কীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধিকে।

কবিগুরু মাতৃবন্দনায় বলেছিলেন, 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।' কিন্তু কবি আজ বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, আনন্দময়ীর আগমনে আতঙ্ক গিয়েছে দেশ ছেয়ে। এনিয়ে সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক স্বল্প আয়ের গৃহকর্তাদের। ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ, অরক্ষণীয়ার বিয়ের ব্যবস্থা, স্ত্রীর চিকিৎসা, বাড়ি ভাড়া, বাজারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আত্মীয় পরিজনের প্রতি সৌজন্য রক্ষা ইত্যাদি তো আছেই। এরই মধ্যে যখন দুর্জয় ক্লাবের ছেলেরা দুর্বার গতিতে সদল বলে গিয়ে চাঁদার বিল নিয়ে দাঁড়ায় এবং গৃহকর্তার মতামত উপেক্ষা করেই মোটা অঙ্কের বিল কাটা শুরু করে তখন গৃহকর্তার বুকটা দুরুদুরু করতে থাকে। এরপর আর অগ্রসর নাই বা হলাম।

দুর্গাপূজার বিশেষ অঙ্গ প্রতিমা বিসর্জন। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি মা ও মেয়েরা, শাশুড়ি ও বধূরা সিঁদুর, ধান দুর্বা, রুপোর টাকা রেকাবে (ছোট পিতলের থালা) সাজিয়ে দেবী দুর্গার চরণস্পর্শ করতে যান ধীর পদক্ষেপে। পড়ুয়াদের হাতে থাকে বই। শিল্পীদের হাতে থাকে স্ব স্ব কর্মকুশলতার যন্ত্রপাতি। কারো মুখে কথা নেই, নীরব নিশ্চুপ। ছলছল আঁখি, বেদনাহত মন। মায়ের মুখপানে চাইলেই দেখা যেত বিষাদের ছায়া, চোখ অশ্রুসজল। এ যেন পিতৃগৃহ থেকে কন্যার পতিগৃহে যাত্রা। এরপর প্রতিমা নিরঞ্জনের পর্ব সেরে প্রশস্তি বন্দনায় বসতাম সকলে মিলে। গায়ে ছিটানো হোত শান্তিবারি মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। কলাপাতায় দেওয়া হোত ভাজা চিড়ে, নারকেল, বোঁদে, নাড়ু, মুড়কি আরও কত কী! এরপরই শুরু হোত প্রণাম, আলিঙ্গন ও আশীর্বাদের পালা। মায়ের জন্যে মনটা যেন হাহাকার করে উঠত। চারদিকে অসীম শূন্যতার মাঝে মনে পড়ত মাইকেলের মেঘনাদ বধের উক্তিগুলো—

''বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।''

মহাশক্তিময়ী দুর্গার আবাহন করে আমরা আত্মবলে বলীয়ান হব। নিছক আনুষ্ঠানিকতা ভুলে পূজার মর্মবাণী অন্তরে উপলব্ধি করব। মনের সকল আবিলতা ও সংকীর্ণতা ভুলে যাব। বিজয়ার শুভেচ্ছা বাণীকে জীবনে উপলব্ধি করে গড়ে তুলব প্রেমময় বিশ্ব। এই হোক পূজার প্রাক্কালে আমাদের শপথ। ■

চিরদিনের গল্প

দেবীর সংসার

অর্ক দাস (নবম শ্রেণী, কোচবিহার)

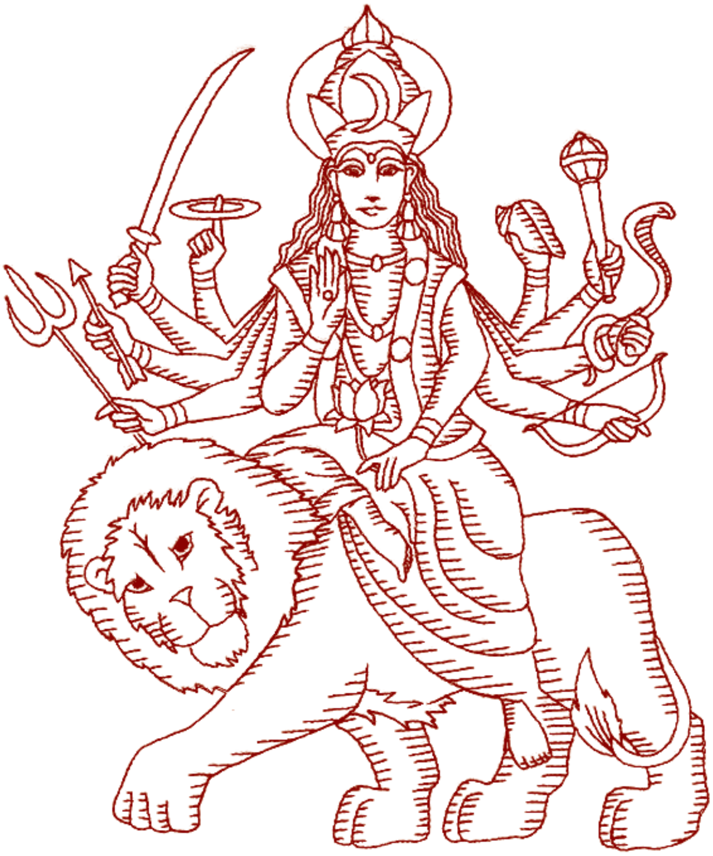

বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। এই সময় মা দুর্গা তাঁর পরিবার নিয়ে মর্ত্যে আসেন বাপের বাড়িতে। সঙ্গে আসে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। সপরিবারে তিন দিন মর্ত্যে থেকে মা আবার স্বর্গে ফিরে যান। মর্ত্যের সব মানুষ এই কটাদিন মেতে থাকে দেবীর আরাধনায়।

মা দুর্গা এই তিনদিন বাপের বাড়িতে এসে একটু আরামে থাকেন। এখানে সবাই তাদের আদর যত্ন করে। সারা বছর তো দেবীর কোনো ফুরসত নেই। দশহাতে তাকে সংসারের কাজ সামলাতে হয়। চার ছেলেমেয়ে, স্বামী নিয়ে সংসার। কত কাজ।

বড় মেয়ে লক্ষ্মী। খুব শান্তশিষ্ট। একটু বেশি সাজগোজ করে, কিন্তু খুব কাজের মেয়ে। সংসারের কাজে সেই একমাত্র মা'কে সাহায্য করে। হাতে হাতে সব এগিয়ে দেয়। টুকিটাকি

কাজের কথা তাকে বলতে হয় না, নিজে থেকেই করে। মায়ের খুব ভরসা লক্ষ্মীর উপর। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। এই পেঁচাটি সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকে। লক্ষ্মী যেখানেই যায় পেঁচাও তার সঙ্গে যায়। মায়ের সঙ্গে মর্ত্যে আসার সময় পেঁচাও তার সঙ্গে আসে। নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু খেতে খুব ভালোবাসে লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে খুশি রাখতে মা দুর্গাকে মাঝে মাঝেই নাড়ু তৈরি করতে হয়।

দেবী দুর্গার আরেক মেয়ে সরস্বতী। তার অনেক গুণ। সবসময় তার এক হাতে থাকে বীণা, আরেক হাতে থাকে বই। খুব সুন্দর গান গায় সরস্বতী। মিষ্টি গলা তার। নাচে গানে যেমন পারদর্শী তেমনি পড়াশুনাতেও খুব ভালো। তার মতো মেধা স্বর্গে মর্ত্যে আর কারো নেই। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। তাই

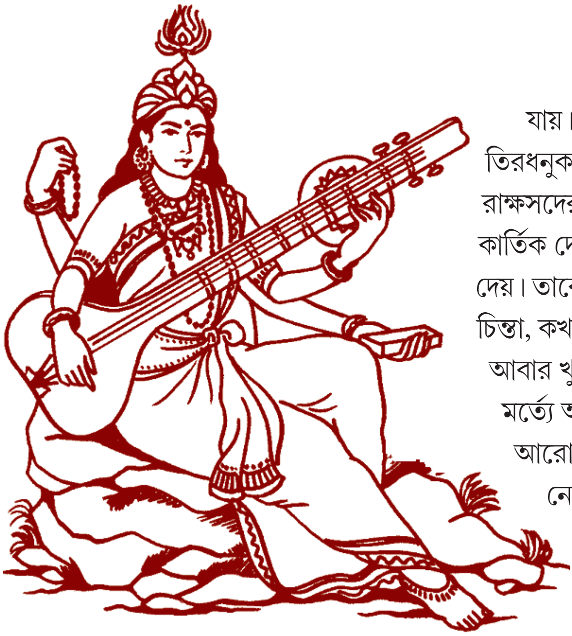

মর্ত্যের মানুষ বিদ্যালাভের জন্য সরস্বতীর আরাধনা করে। সরস্বতীও তার বাহন হাঁসকে নিয়ে বিদ্যে বিলিয়ে

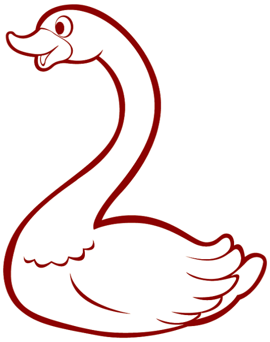

বেড়ায়। এতে মানুষের উপকার হয় বটে কিন্তু দেবীর কোনো কাজে লাগে না। কারণ সংসারের কাজে সে একেবারে লবডঙ্কা।

মায়ের সুপুত্র হলো কার্তিক। সে দেবতাদের সেনাপতি। দেখতেও সুপুরুষ। বাহন ময়ূর নিয়ে সে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ময়ূর সঙ্গে থাকায় তার রূপ যেন আরো বেড়ে যায়। হাতে থাকে তিরধনুক। দেবতাদের সঙ্গে রাক্ষসদের যুদ্ধ শুরু হলে কার্তিক দেবতাদের নেতৃত্ব দেয়। তাকে নিয়ে দেবীর খুব চিন্তা, কখন কী হয়। কার্তিক আবার খুব রূপ সচেতন। মর্ত্যে আসার আগে সে আরো ভালো করে সেজে নেয়।

দেবীর ছোট ছেলে গণেশ। সে খাওয়া ছাড়া কিছুই বোঝে না। খেয়ে খেয়ে তার ভুঁড়িটা বেড়েই চলেছে। সবার চিন্তা কোনদিন ফেটে না যায়। গণেশের খুব ইচ্ছে, সেও কার্তিকের মতো চেহারা বানাবে। কিন্তু খাওয়াটা সে কিছুতেই কমাতে পরছে না। জন্মের পর গণেশের মাথায় হাতির মাথা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন থেকেই সে হাতির মতো খায়। এক ঝুড়ি লাড্ডু একবারেই খেয়ে নেয়। কিন্তু খুব কষ্ট তাঁর বাহন ইঁদুরের। এতবড়ো গণেশকে সে কোথাও বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। গণেশের খাবারের যোগান দিতে দেবী দুর্গাও মাঝে মাঝে হিমসিম খায়।

সারাবছর সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। শরৎকাল এলেই চার ভাইবোন আনন্দে নাচতে থাকে। মাকে রোজই বলতে থাকে— মা আর কতদিন, আর কতদিন। দেবীও ব্যস্ত হয়ে পড়েন সবকিছু গোছাতে। কিন্তু মন খারাপ মহাদেবের। দেবী তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে মর্ত্যে গেলেও সঙ্গে নেন না মহাদেবকে। অগত্যা কৈলাসেই থাকতে হয় মহাদেবকে।

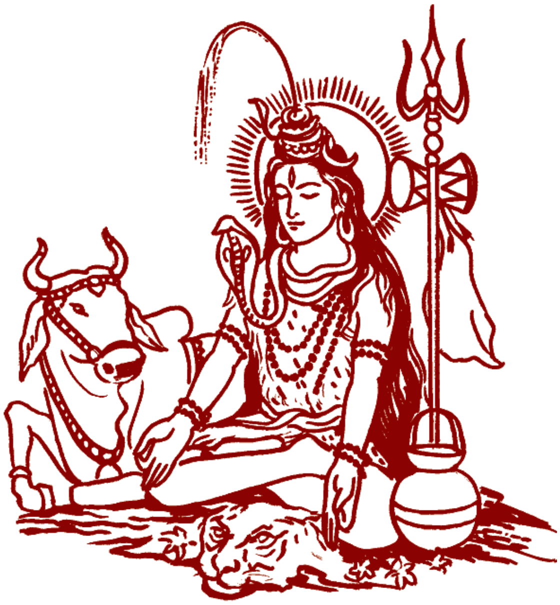

অঙ্গনা

প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় চাই

শবরী ঘোষ

বেশ কিছুদিন যাবৎ টিভি-র পর্দায় আমরা একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছি যেখানে জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিদ্যা বালন একটি মেয়ের সঙ্গে বহু মানুষের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েটির নাম প্রিয়ঙ্কা ভারতী। অতি সাধারণ মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়ঙ্কার অসামান্যতা এইখানে যে তিনি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে খোলা স্থানে শৌচকর্ম করতে অস্বীকার করেছিলেন। শুধু

তাই নয়, সেই বাড়িতে শৌচালয় বানানোর দাবি জানিয়ে তিনি সেখান থেকে নিজের বাপের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। প্রিয়ঙ্কার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তাঁর শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের শৌচালয় সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

ভারতের বহু গ্রাম্য ও শহুরে পরিবারে এখানো পর্যন্ত শৌচালয় নেই। নিরুপায় হয়ে এইসব পরিবারের মানুষকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মাঠে অথবা জঙ্গলে যেতে হয়। খোলা স্থানে শৌচকর্ম করলে সেখান থেকে নানা ধরনের রোগ ছড়াতে পারে। তাছাড়া মেয়েদের পক্ষে এভাবে যত্রতত্র শৌচকর্ম সারা সম্মানহানিকরও বটে। গভীর রাতে মাঠে শৌচকর্ম সারতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের লালসার শিকার হয়েছেন বহু মেয়ে এমন বহু ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রতিটি পরিবারেরই এখন উচিত শৌচালয় নিয়ে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করা।

কয়েক মাস আগে মহারাষ্ট্রের অকোলার চৈতালি গলাখের বিয়ে ঠিক হয় যবতমালের দেবেন্দ্র মখোড়ের সঙ্গে। চৈতালি যখন জানতে পারেন যে তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়িতে শৌচালয় নেই তখন তিনি তাঁর পরিবারকে অনুরোধ করেন যে তাঁর গহনা বা অন্য কোনো উপহারের প্রয়োজন নেই। শুধু তাঁর শৌচালয়ের প্রয়োজন। আনন্দের বিষয় যে, চৈতালির এই সাধ পূর্ণ হয়েছে। শুধু তাই নয়, নবভারত টাইমস পত্রিকা জানাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সঙ্গে যুক্ত স্বয়ংসেবী সংস্থা শৌচালয় বানানোর দায়িত্ব নিয়েছে। ২০১৫ সালের মে মাস পর্যন্ত ১২ হাজার মেয়ের পরিবারকে এরকম শৌচালয় প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সব বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচালয় নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য অবশ্যই তাঁর সাধুবাদ প্রাপ্য। কিন্তু স্কুল-কলেজের নির্দিষ্ট সময়টিকে বাদ দিলে মেয়েরা অধিকাংশ সময় নিজেদের বাড়িতেই কাটায়। তাছাড়া শুধু বালিকা বা কিশোরীদের কথা ভাবলেই তো চলবে না। প্রতিটি পরিবারে আরো বিভিন্ন বয়সী মহিলা থাকেন। তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার দিকটাও ভাবনাচিন্তা করা উচিত। একজন মা নিজে সুস্থ থাকলে তবেই কিন্তু তার সন্তানরা সুস্থ থাকতে পারে। আবার বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি থেকে অনেক দূরবর্তী কোনো জায়গায় গিয়ে শৌচকর্ম করা খুব কষ্টকর। তাই স্কুল-কলেজের পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় তৈরি করা উচিত। স্বচ্ছ ভারত নির্মাণে প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন দেশবাসীরও উচিত তাতে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে স্বচ্ছ গৃহ ও স্বচ্ছ সমাজ গড়ে তোলা। প্রিয়ঙ্কা বা চৈতালি যেরকম দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন, আগামী দিনে আরো অসংখ্য মেয়ে তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শৌচালয়ের দাবিতে এগিয়ে আসবেন আশা করি।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

সৌদি আরবে মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার

একুশ শতাব্দীতে এক বড় পদক্ষেপ

অতিথি কলম

মুজফ্‌ফর হোসেন

সৌদি আরবের নাম কানে শোনামাত্র আমার চোখের সামনে এমন এক দেশ ভেসে উঠল যেখানে কেবল বালি আর বালি। ওই রাশি রাশি বালির মধ্যে একা আরব, যার হাতে ধরা আছে উটের নাকের দড়ি। যার পিছনে চলছে লম্বা উঠের সারি। এখানকার রাজা কট্টরপন্থী হিসেবে জগৎ প্রসিদ্ধ। কিন্তু খনিজ তেলের বিশাল খনি থাকার জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশ তাকে সমীহ করে চলে। এখানকার রাজাকে ইসলামিদেশগুলোর শাহেনসা বলা হয়। কারণ তিনি হলেন বড় তীর্থক্ষেত্র মক্কামদিনার মালিক। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান সেখানে হজযাত্রা করে ধন্য হয়। কেবল ইসলামি দেশই নয়, বিশ্বের সমস্ত শক্তিশালী দেশগুলিও তার আশপাশে ঘোরাফেরা করে। ওখানে মাটি কিছু কম নেই, কিন্তু বালির সমুদ্র হওয়ার কারণে সবুজ ভাব কেবল শহরের আশেপাশেই দেখা যায়। মহিলাদের রাস্তায় বেরোতে দেখা যায় না। যদিও বা দেখা যায় তাদের শরীর পর্দায় ঢাকা। তারা গাড়ি চালাতে জানে না এবং একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কেবল মাদ্রাসাতে

ভোটের লাইনে সৌদি মহিলারা।

গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মহিলা জগতের যতরকম প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তা সব ওখানে দেখা যায়। গণতন্ত্রের পাখি ওখানে উড়তে দেখা যায় না এবং স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় না। কিছুদিন পূর্বে সংবাদমাধ্যমে পড়ে জানা গেল যে সেখানকার কট্টরপন্থী রাজা দেশের মহিলাদের ভোট দানের অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু যেখানে গণতন্ত্রই নেই সেখানে ভোট দেওয়ার অধিকারের অর্থ কী? অবস্থা যাই হোক, অতপর সৌদি মহিলাদের ভোটাধিকার প্রাপ্তি ইসলামি দুনিয়াতে এক বিরাট পরিবর্তন। রাজা একনায়তন্ত্রী হওয়ার কারণে গণতন্ত্রের কোনো প্রভাব তো নেই, কিন্তু নগর, পঞ্চায়েত বা এই প্রকার কোনো গণতান্ত্রিক সংস্থাতে সৌদি মহারাজা মহিলাদের ভোটাধিকার দিয়েছে।

সৌদিতে সবাই ভোটের কথা শুনেছে। ওই দেশ এমনই, যেখানে বিদ্যালয় নিরীক্ষক কোনো ছাত্রীকে প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিয়েছে যে বিশেষ কোনো কবিতার প্রতি তার প্রেম আছে (ভাল লাগা)। ছাত্রীর মুখে 'প্রেম' শব্দ শুনতেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও নিরীক্ষক অবুঝ কমবয়সী ছাত্রীকে বিদ্যালয় থেকে বের করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নিরীক্ষক মহাশয় ওই ছাত্রীকে শাস্তি হিসেবে স্কুল থেকে তার নাম খারিজ করে দিয়েছে। তাই ওই আরবি সমাজে মহিলাদের যদি ভোটদান অধিকার দেওয়ার কথা শোনা যায় তা চমৎকারই লাগে। সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে যেভাবে খোলা পরিবর্তন এসেছে তার ফলস্বরূপ মক্কা মদিনার দেশের মহিলারা ভোট দিতে পারবে। সৌদি মহিলাদের কাছে এই সংবাদ এসে গেছে যে আগামী পৌরসভা/নগরপালিকা ভোটে তারা ভোট দিতে পারবে। ২১ শতাব্দীতে বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে গেছে যে সৌদি রাজা লোকতন্ত্রের ভান করছে এবং পুরুষ জনগণের সঙ্গে মহিলাদের গণতান্ত্রিক সুফল ভোগ করার কথা ভেবেও দেখবে না। সৌদি আরবে এই সামাজিক পরিবর্তনের কারণে ইসলামি জগতের কট্টরবাদীরা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

এই আদেশের ফলে এটা নিশ্চিত যে মক্কামদিনা, তাইফ, রিয়াদের মতো বড় শহরে আগামী যে নগরপালিকা নির্বাচন হবে (হজযাত্রা সমাপ্ত হওয়ার পর) তাতে ওখানকার মহিলারা প্রথমবার ভোটদান করবে। একথা সমস্ত সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে একথাও বলা হয়েছে যে মহিলারা ভোট দিতে পারলেও ভোটে প্রার্থী হতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে দৈনিক গেজেটের বক্তব্য— আপাতত মহিলাদের আংশিক বিজয় হয়েছে। যেদিন মহিলারা স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে কেবল সদস্যাই নয়, মেয়র হতে পারবেন— আসল জয়লাভ

তখনই হতে পারবে। তবুও সৌদি মহিলাদের গণতন্ত্রের প্রথম ধাপে যতটা সফলতা এসেছে তাতে প্রবাসী সৌদি নাগরিকেরা স্বাগত জানিয়ে নিজেদের প্রসন্নতা ব্যক্ত করেছে। নিজেদের দেশে এই আদেশের মধ্যে সারবত্তা না থাকলেও বিদেশে বসবাসকরারী সৌদি মহিলারা পরস্পর সৌজন্য বিনিময় করছে এবং বিশ্বাস রাখছে যে বর্তমানে সাংসদ হওয়া বা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গড়ার স্বপ্ন সফল হবে। আরবের মাটিতে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতেও পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু সৌদির প্রবাসী নাগরিকদের জন্য আসল গণতন্ত্র আসতে অনেক দেরি। কিছুদিন পূর্বে দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টে বলেছে, সোশ্যাল মিডিয়ার লোকপ্রিয়তার কারণে পত্রিকার বিক্রি হঠাৎ করে কমে গেছে। এর ভিত্তিতে বলা যেতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া ও সমাচারের শক্তি বাড়লে সামাজিক ভাবনাকেও তা প্রভাবিত করছে। এই প্রকার খবরের ফলে সৌদি আরবে চিন্তার স্বাধীনতার এক নতুন পথ দেখা যাবে— এই আশা জাগছে। এখন তো এর বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একে তো শিক্ষাজগতে সৌদি আরবে পশ্চাদগামীতা ও আমেরিকার মতো দেশ নিয়ম নীতি চালু করেছে— কোনো পিছিয়ে পড়া দেশে সামাজিক ক্রান্তি আসা ওদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু যখন 'ঘুমন্ত ড্রাগন' চীন জেগে উঠেছে এবং তার শক্তি সমগ্র দুনিয়া মেনে নিয়েছে তখন সৌদি আরবে সামাজিক বিপ্লব আসাটা আশ্চর্যের বিষয় হবে কি? এই পরিবর্তনকে গণতন্ত্রের চমৎকার বলা যাবে। কিছুদিন পূর্বে সৌদি আরবে অনেক শহরের পঞ্চায়েত ও নগরপালিকা নির্বাচনে মহিলাদের প্রথমবার ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদে আজও অনেক লোক বিশ্বাস করছে না, কিন্তু বাস্তবিক পরিস্থিতি স্বীকার করতে বাধ্য। এটাকে মহিলা জগতে আসা বিপ্লব বলে সৌদি-সহ দুনিয়ার অনেক বড় দেশের সংবাদপত্র সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আজ পর্যন্ত সৌদি মহিলারা অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল— তাই এটা অন্ধকারের মধ্যে প্রথম আলোর রেখার মতো। দেশে বিদেশে সকলে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে সৌদি আরবের রাস্তায় মহিলারা গাড়ি চালাতে পারত না সেখানে বর্তমানে তারা প্রশাসন ও সরকার গঠনে অংশীদার হচ্ছে। অবশ্যই এটা ওদের কাছে বড় পরিবর্তনের পালা বলা যেতে পারে। যে সমস্ত মহিলারা নিজেদের নাম ভোটার তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছে তাদের বলা হচ্ছে বর্তমানে তারা কেবল ভোটারই নয়, ভোটে প্রার্থী হয়ে নির্বাচন লড়তে পারবে। তাদের এই আশীর্বাদ স্বর্গীয় রাজা আবদুল্লা ২০১১ সালেই দিয়ে গেছেন। কিন্তু গত দু' বছরের সংঘর্ষের পরিণাম স্বরূপ সৌদি মহিলারা ভোটদান করবে এবং নির্বাচনে লড়ে নগর প্রশাসনে ভাগ্যবিধাতা হতে পারবে। প্রাক্তন রাজা আবদুল্লাকে এখানকার জনতা প্রগতিশীল রাজা বলছে। কারণ গত দু' বছরে যা পরিবর্তন এসেছে, বিগত হাজার বছরেও তা আসেনি। আর তাঁর সময় থেকে রাজার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এইজন্য পরিবর্তনের বাহক রাজা আবদুল্লার প্রতি জনতা বিশেষত সৌদি মহিলারা কৃতজ্ঞ। শাহ আবদুল্লা নিজের পরামর্শদাতা মহলে মহিলাদের স্থান দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুই ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশি ভাল কাজ করতে পারবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় ২০১৩-তে লন্ডনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য সৌদি মহিলাদের সম্মতি দেওয়া হয়েছে। সৌদি মহিলারা নিজেদের শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে এই প্রতিযোগিতায় ভাগ নিয়েছিল। যদিও এখন সরকারিভাবে মহিলারা রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারে, তা সত্ত্বেও সর্বসাধারণ দৃশ্য বলা যাবে না। এর পিছনের নিয়ম রাজার নয়, বরং ওখানকার সমাজে ফতোয়া প্রদানকারী মোল্লা বা মৌলবীদের। সৌদি আরবে শরিয়ত ও সুন্নত নিয়মে সমাজ চলে। তাই মোল্লা বা মৌলবিরা সাধারণ জনগণকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয় না। ওদের প্রভাব এতটাই প্রবল যে মৌলবীদের সামনে কেউ মন খুলে কথা বলতে পারে না। ওদের বক্তব্য ইসলামি শরীয়তের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। ধর্মভিত্তিক শাসন হওয়ার জন্য মৌলবীরাই প্রধান। তাই ওখানকার জনগণকে আসল লড়াই লড়তে হবে কাটমুল্লাদের বিরুদ্ধে। সৌদি আরবের রাস্তায় কোনো মহিলা একা বেরোতে পারে না। যদি যেতেই হয় তবে সঙ্গে কোনো সঙ্গী থাকা চাই যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে। পর্দানসীন হয়েও ওদের একা বাইরে যাওয়া মুশকিল। এটা বড় কঠিন শর্ত যা সমস্ত পরিবারকে মানতে হয়। মহিলারা যদি গাড়ি চালায় তবে পাশে কোনো নিকট সম্পর্কের সঙ্গীকে বসাতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্সে এই শর্ত লেখা আছে। উলেমাদের ফতোয়া সরকারি নিয়মের মতোই মানা বাধ্যতামূলক। সৌদি মহিলারা স্টেডিয়ামে গিয়ে ফুটবল ক্রিকেট খেলা দেখতে পারে না। কারণ মোল্লাদের বক্তব্য মহিলারা খেলা দেখতে যায় না, পুরুষ খেলোয়াড়দের জঙ্ঘা দেখতে যায়। এই প্রকার নোংরা মানসিকতাকে কেউ মেনে নিতে পারে কি? সৌদি আরবে মহিলাদের 'ড্রেস কোড' খুবই গভীরভাবে পালন করতে হয়। ভিতরে যে কোনো বস্ত্র পরতে পারে কিন্তু উপরে একটা লম্বা কোটের মতো বস্ত্র পরতেই হবে। এর অবাধ্য হলে মৃত্যু। এই দণ্ড থেকে কারও মুক্তি নেই। পাঠকরা অবশ্যই জানেন যে এক রাজকুমারী পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে তার শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। এই দণ্ড প্রতি শুক্রবার দুপুরে নমাজের পর প্রকাশ্য স্থানে ঘোষণা কর হয়।

সৌদি নিয়ম অনুসারে টিভি-তে খবর পড়া বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় মহিলাদের বস্ত্র সম্পর্কিত নির্ধারিত কোড মানতে হয়। একথা জানার পর কোনো ব্যক্তি বলতে পারেন--- যে দেশে মহিলাদের এত প্রতিবন্ধকতা, সেখানে মহিলাদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া ২১ শতাব্দীতে এক বড় পদক্ষেপ। ∎

হিন্দু ভোটেই মিলে যাচ্ছে বাজিমাতের অঙ্ক
কেরল জয় বিজেপি-র কাছে আর দূরে নয়

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

কেরলে বিজেপি তার রণকৌশল দ্রুত বদলে ফেলছে। তাদের চালচলনে একটা স্বস্তির ভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে কেরলে ২৭ শতাংশ মুসলমান ভোট আর ১৮ শতাংশ খৃষ্টান ভোট, সেখানেও এখন সবল হিন্দুত্বের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। সমীকরণটা তাহলে কী? অমিত শাহের নিঁখুত ভোটের অঙ্কে বাদবাকি ৬৫ শতাংশ হিন্দুভোটই হলো সেখানে বিজেপি-র বাজির ঘোড়া। অনগ্রসর এজাভা, বর্ণহিন্দু নাম্বুদিরি ও তফশিলি পুল্যায়ার ভোটকে একাকাট্টা করার কঠিন সমীকরণের মধ্যেই রয়েছে তাদের হিন্দুত্বের ভেলকি দেখানোর অঙ্ক। সামাজিকভাবে হিন্দুদের একজায়গায় আনা যেখানে অত্যন্ত কঠিন কাজ, সেখানে রাজনৈতিকভাবে সেটা কতটা করা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। মার্কসবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আধুনিকমনস্ক অনেক বনেদি মালয়ালমভাষী হিন্দুরা যদিও আজ তাদের নামের পেছনে আর সম্প্রদায়ের পদবি লেখেন না, তবুও তাদের সমাজে এখনও জাতপাত নিয়ে মাথাব্যথাটা ভীষণভাবে রয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কারও জাত পরিচয় না জানছে আর কোনো গোষ্ঠীভুক্ত না করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই শ্রেণী সচেতনতার হাত থেকে রেহাই নেই। খোদ দলের অন্দরেই যখন এইসব সম্প্রদায়ের নেতাকর্মীদের দ্বন্দ্ব বেশ খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পায়, সেখানে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনসহ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র হিন্দুত্বের মন্ত্র এই ব্যবধান ঘোচাতে পারবে কি? কেরল বিজেপি সভাপতি ভি. মুরলীধরন অবশ্য আশাবাদী যে, কেরলের ঠেকা নেওয়া কংগ্রেস চালিত ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউ ডি এফ) এবং সিপিএম চালিত লেফ্‌ট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এল ডি এফ)-এর মধ্যে পালা করে কেরলে সরকার গড়ার প্রথা এবার শেষ হবে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি তৃতীয় বিকল্প শক্তি হয়ে উঠে আসবে। কিন্তু যে দলটা ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোনো আসন দখল করতে পারেনি, মাত্র ৬ শতাংশ ভোট নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে, তার পক্ষে এমন আশা করাটা কি একটু বেশি মাত্রার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পর্যায়ে পড়ে না? বিজেপি কিন্তু ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে তাদের ১০.৩ শতাংশ ভোট আর এ বছর জুনে আরুভিক্কারা উপনির্বাচনে তাদের ভোট এক ধাক্কায় বেড়ে ১৭ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ায় যথেষ্ট আশার আলো দেখছে। এমনকী তারা ওয়ার্ডভিত্তিক প্রতিটি ভোটদাতার বংশপরিচয়, ধর্ম ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসম্বলিত তালিকা তৈরি করে তাদের নির্বাচনী পরিকল্পনা ছকে ফেলেছে। এই তালিকার তিনটি কলমে ভোটারদের ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে আছে— এক, যাঁরা নিশ্চিতভাবে বিজেপি-কে ভোট দেবেন, দুই, যাঁরা বিজেপি-কে ভোট দিতে পারেন, তিন, যাঁরা কোনোভাবেই বিজেপি-কে ভোট দেবেন না। বিজেপি-র লক্ষ্য হলো সেইসব ভোটদাতারা যাঁরা বিজেপি-কে ভোট দিতে পারেন। সম্ভাব্য ভোটদাতাদের ভোট সুনিশ্চিত করতে তারা প্রচারাভিযান চালাবে। লোকনীতি নামে একটি সংস্থার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে, খৃষ্টান সম্প্রদায় যাঁরা প্রথাগতভাবে জাতীয় কংগ্রেস বা কেরল কংগ্রেসকে ভোট দেন তাঁরাও কিন্তু 'মোদী ঝড়'-এর প্রভাব মুক্ত হতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে ৯ শতাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। এমনকী মুসলমান ভোটের ১৬ শতাংশ বিজেপির ঝুলিতে গেছে। তবে এখনও পর্যন্ত সেইসব ভোটদাতাদের নিয়ে বিজেপির বিশেষ একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না এমনকী তাদের ভোট ব্যাঙ্কের মধ্যে সেই সংখ্যাকে তারা ধরছে না। রাজ্য বিজেপি সভাপতি মুরলীধরন মনে করেন যে এ ব্যাপারে অমিত শাহ্ স্পষ্টবার্তা দিয়েছেন যে কেরলে বিজেপি কংগ্রেস ও

ভি সাতেসান

মুরলীধরন

নীলকান্তন

সিপিএমের বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে কোমর বেঁধে নামবে। স্থানীয় নির্বাচনে তারা সমস্ত আসনেই লড়বে। বিজেপি নিজস্ব দলীয় প্রতীকেই প্রার্থীদের লড়াবে, খুব সামান্যই নির্দল প্রার্থী দাঁড় করাবে। সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়েরই তারা প্রতিনিধিত্ব করবে এবং বেশিরভাগ প্রার্থীই হবে হিন্দু প্রার্থী। বিধানসভায় ১৪০টি মধ্যে অন্তত ১২৫টি আসনকে নিশানা করে তারা এগোবে। এর থেকে এটা পরিষ্কার যে, মুসলমান অধ্যুষিত মালাবারের আসনগুলি তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না।

বিহারে যেভাবে মহাদলিত জিতনরাম মাঝিকে নিজেদের দিকে টেনেছে, সেই একই কায়দায় বিজেপি এজাভা নেতা ভেল্লাপল্লী নাতেসানের মন জয় করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রায় একশতক আগে শ্রী নারায়ণ গুরু অনগ্রসর এজাভাদের উন্নয়নে 'শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন (SNDP) যোগম্'-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন নাতেসান তার সাধারণ সম্পাদক। কেরলে এজাভারাই সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় যারা এতকাল বামেদের সঙ্গে থেকেছে। যদি কোনো ভাবে এই সম্প্রদায়ের ভোট ভাঙিয়ে বিজেপি নিজেদের দিকে টানতে পারে তবে, সেটাই হবে কেরল রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় পাশার দান উলটে দেবার খেলা। ইতিমধ্যেই বিশ্বহিন্দু পরিষদ নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া SNDP যোগম্-এর সঙ্গে মিলে ইদুকী জেলায় একটি হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা করছেন যাতে গরিব হিন্দুদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হবে। শ্রীনারায়ণ গুরুর জন্মজয়ন্তী উদযাপনে গত ৩০ আগস্ট নাতেসানের অতিথি ছিলেন বিজেপি-র সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি যিনি মন্তব্য করেছেন যে, 'অধার্মিকদের হাত থেকে নিজেদের মেয়েদের বাঁচাতে হিন্দুদের এগিয়ে আসতে হবে।' এ থেকে প্রমাণিত হয় যে সেখানে হিন্দুত্বের জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। সম্প্রতি নাতেসান আর তাঁর ছেলে তুষার দিল্লীতে অমিত শাহ্-এর সঙ্গে দেখা করায় রাজনৈতিক মহলের অনুমান যে তুষারকে রাজ্যসভার সাংসদ করার বিনিময়ে নাতেসান বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যও যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। তিনি বলেন যে, 'বিজেপি অচ্ছুত দল নয়। আমরা উভয়ে মিলে একটি সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলতে চাই যার উদ্দেশ্য হবে নাম্বুদিরি থেকে নয়াদী, জাতপাত নির্বিশেষে হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলা।' আর এটাই হলো সংক্ষেপে বিজেপির বক্তব্য। ২০০৯ সালে যেখানে বিজেপির এজাভা ভোট ছিল মাত্র ১২ শতাংশ, ২০১৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৩ শতাংশ। এখন প্রশ্ন হলো যে, বিজেপি কি নাতেসানকে দিয়ে তাদের গোষ্ঠীর ভোটকে আরও বেশি মাত্রায় নিজেদের দিকে টানতে পারবে? যদি তাই হয়, সেটাই হবে কেরলে বামেদের শেষের শুরু। ইতিমধ্যেই বিজেপি কেরল পুলায়ার মহাসভার সমর্থন আদায় করে নিয়েছে। এর সভাপতি এন কে নীলকান্তন মন্তব্য করেছেন যে, 'এটা প্রায়শই বলা হয় যে আমাদের আজকের অনগ্রসরতার জন্য সঙ্ঘই দায়ী। তারা যদি নিজেদের সংশোধন করতে চায় তবে আমরাও সেইসব ইতিহাস ভুলে যেতে চাই।'

এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই সেকুলারবাদীদের ঘুম ছুটতে চলেছে। দিশেহারা সিপিএম (এম) হঠাৎ সুরবদল করে বলতে শুরু করেছে যে হিন্দুদের অধিকার খর্ব করে, সংখ্যালঘুদের তোষণ করে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিসরকে ছোট করা উচিত নয়। এস এন ডি পি এবং বিজেপি-র আঁতাতকে কীভাবে ঠেকানো যায় তা তারা বুঝে উঠতে পারছে না। বিরোধী দলনেতা ভিএস অচ্যুতানন্দ মন্তব্য করেছেন যে, 'নাতেসান কীভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তা সিপিএম জনসমক্ষে আনতে চায়। শ্রী নারায়ণ গুরুর মহান ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারাকে কলঙ্কিত করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। গুরুজী বলতেন যে, ধর্ম যাই হোক না কেন, উন্নততর মানুষ তৈরিই তাঁর লক্ষ্য।''

নয়ের দশক থেকেই বিজেপি কেরলে অনগ্রসরশ্রেণীর মন জয় করার কাজ করে আসছে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে ইতিমধ্যেই তারা সাফল্য লাভ করেছে। এবার কেরলেও সেই কাজটি তারা সুপরিকল্পিতভাবে করতে চলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল। কেরলে দ্রুত গতিতে মেরুকরণ ঘটছে। হিন্দুরীতি বলে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী মুসলিম লিগের পি কে আব্দুরার একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালাতে অস্বীকার করায় এবং তাঁর সরকারি বাসভবনের নাম 'গঙ্গা'-কে পালটে 'গ্রেস' করায় সেখানকার হিন্দুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই সমস্ত ঘটনাকে তুলে ধরে বিজেপি ইউডিএফ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন তুলছে। মুরলীধরন বলেছেন যে, 'আমরা এইসব ঘটনাকে প্রচারের হাতিয়ার করতে চাই। মুসলিম লিগ নিস্তার পাবে না। হিন্দু উৎসব বলে তারা ওনামকেও নিষিদ্ধ করবে। পুক্কালাম ও থিরুভথিরাক্কালিও বাতিল করতে চাইবে। হিন্দুরা এই রাজ্যে সবচেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে'। কিছু তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা বিজেপিকে 'কাগুজে বাঘ' বললেও সমর্থকরা কিন্তু মোদীতেই আচ্ছন্ন। সারাদেশে যেখানে বিজেপি নিয়ে উৎসাহী লোকেরা প্রকাশ্যেই সরব হচ্ছেন, সেখানে কেরলে উগ্র বামপন্থীদের ভয়ে তারা মুখ খুলছেন না, কিন্তু তলে তলে মনস্থির করে ফেলেছেন। মাধবন মনে করেন যে স্থানীয় রাজনীতি থেকেই বিজেপি বুদ্ধি পেয়েছে। কেরলে ইউডিএফ এবং এলডিএফ-এর মধ্যে বোঝাপড়ার রাজনীতি চলে। ইউডিএফ-এর ছাতার তলায় জড়ো হন। এবার বিজেপি সমঝদারির সঙ্গে তাদের এই চালাকির খেলায় হিন্দুভোটের একটা অংশে ভাগ বসাতে চাইছে। তবে এটাও একটা পুরনো কৌশল। এখন কেরলেও জাতপাতের চেয়ে উন্নয়নের অঙ্কে ভোটচরিত্র ঠিক হবে। বিজেপি কিন্তু মালয়ালমভাষীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। সেকারণে অনগ্রসরদের নিয়ে রাজনীতি বহুমুখী পরিকল্পনার একটি অংশ। সম্প্রতি বিহারের মতো কেরলেও মোদী সরকার উন্নয়ন প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারেন যাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় যে বিজেপি সরকার কাজের সরকার। তবুও তিরুবনন্তপুরমের মতো কিছু নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে বিজেপি এখনও শক্তি জাহির করতে পারেনি। কিন্তু খেলাটা বদলে দেবার আগে তারা বিরোধীদের সব ছক বানচাল করে দিতে শুরু করেছে। কেরলের সবুজে বিজেপি যেভাবে গেরুয়া রং ছড়াচ্ছে তা খালি চোখেই বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবেশী দেশ

অর্ধ শতাব্দীতেও শুধরালো না পাকিস্তান

তারক সাহা

পাকিস্তানে রাজা পালটেছে বহুবার এই অর্ধ শতকে। বদলায়নি একটুও তার ভারত-বিরোধী নীতি। ২০১৫ সাল হলো ১৯৬৫ সালের ঘোষিত পাক-ভারত যুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী বছর। গত ৫০ বছর ধরে পাকিস্তান ৬ সেপ্টেম্বর তারিখটা ভারতের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় উৎসব বলে মেনে এসেছে। এ বছরে অবশ্য ভারত ১৯৬৫ সালের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হিসেবে পালন করছে। দুই দেশের এই দুই উৎসব পালনের লক্ষ্য ভিন্ন। পাকিস্তান একটা মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে সেদেশের মানুষদের বিভ্রান্ত করে এসেছে এযাবৎ কাল। ভারত কিন্তু মর্যাদার সঙ্গে এই সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে সেই যুদ্ধে বীর শহীদ সেনা-জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

পাকিস্তান ভারতের ওপর চাপানো এই যুদ্ধের পোশাকি নাম দিয়েছিল 'অপারেশন জিব্রালটার'। পাকিস্তানের ভারত বিরোধী মনোভাবের মূলমন্ত্র হলো সে দেশের গরিব-গুর্বো তরুণদের জিহাদের নামে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে এদেশে পাঠিয়ে সীমান্তের জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকেই রুটিন মাফিক এই অপকর্মটি করে যাচ্ছে পাকিস্তান, তা প্রশাসক হিসেবে আয়ুব খানই হোন বা বর্তমানের নওয়াজ শরিফ-ই হোন। বিভিন্ন স্তরে আলাপ-আলোচনা, দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় মঞ্চ রাষ্ট্রপুঞ্জে অভিযোগ জানিয়েও ভারত তার পিঠে বিঁধে থাকা কাঁটাকে উপড়াতে পারেনি গত পঞ্চাশ বছরে। সীমান্তে চলছে ছায়াযুদ্ধ, সেই ফাঁকে চলছে অনুপ্রবেশ।

১৯৬৫ সালের সেই যুদ্ধের মূল নিহিত ছিল অনুপ্রবেশে। সেই সময়ে যুদ্ধের কারণ হিসেবে ঠিক কী ঘটেছিল? অভ্যেসমতো পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশ জম্মু-কাশ্মীরে গোলমাল পাকানোর লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের বেশে ২৫ হাজার পাক-সেনা পাঠানোর চেষ্টা করে 'অপারেশন গ্র্যান্ডস্ল্যাম' কোড নামের আড়ালে। এই চেষ্টা আমাদের জওয়ানরা প্রতিহত করার চেষ্টা করলে পাকিস্তান পুরোপুরি সমরে অবতীর্ণ হয়। তার লক্ষ্য ছিল আখনুর দখল।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যে অপারেশন জিব্রাল্টার চালায় তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান, যিনি নিজে একজন সামরিক প্রশাসক— ঠিক যেমনটা আজও হয়ে আসছে। মাঝে মধ্যে শাসনের রাজদণ্ড অসামরিক প্রশাসকের হাতে গেলেও ভারতের বিরুদ্ধে যাবতীয় সামরিক অভিযান কিংবা সন্ত্রাসী হামলার ছক, পরিকল্পনা সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ থাকে সামরিকবাহিনীর হাতে।

১৯৬৫ সালে সীমান্ত প্রদেশ জম্মু-কাশ্মীরে পরিকাঠামোর অভাবের সুযোগ পুরোপুরি নিয়েছিল পাকিস্তান। সেই সময়ে কাশ্মীরে রাস্তা ছিল না, ছিল না সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া। সেই অভাবের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান দু' দেশের সীমান্তের নিয়ন্ত্রণরেখা দিয়ে ২৫ হাজার অনুপ্রবেশ ঢোকাবার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য পাকিস্তান সেই ট্র্যাডিশান আজও চালিয়ে যাচ্ছে। আজ রাস্তা ভাল হয়েছে, সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের মোকাবিলায় ভারতীয় ট্যাঙ্কবাহিনী।

বেড়াও লেগেছে, কিন্তু উপত্যকায় গোলমাল পাকাবার কাজ আজও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী।

মজার ব্যাপার হলো, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাকিস্তান ভারতের কাছে ব্যাপক হারে মার খেয়ে পর্যুদস্ত হয়েও ৬ সেপ্টেম্বর লাগাতার সে দেশে বিজয় দিবস উদযাপন করে আসছে। এর উদ্দেশ্য স্পষ্টত সেদেশের তরুণ সমাজকে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদি ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য উদ্দীপিত করা। অতি সম্প্রতি ২০১৫-র প্রতিরক্ষা দিবসে পাকিস্তানের সামরিক প্রধান প্রকাশ্যে ভারতকে সে দেশের প্রধান দুশমন বলে চিহ্নিত করে বলেছেন যে, যদি ভারত ভবিষ্যতে পাকিস্তান আক্রমণের দুঃসাহস দেখায় তবে কঠিনমূল্যে পাকিস্তান তা ফিরিয়ে দেবে। পাকিস্তান এখন পরমাণু শক্তিধর দেশ। পরমাণু যুদ্ধের কথা প্রচ্ছন্নভাবে দিয়ে রাখল পাকিস্তান। সামরিক প্রধানের এই হুমকি সমর্থন করেছে এন এস এ এবং মন্ত্রীরাও। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ পাকিস্তান মনে করে এক অসমাপ্ত সামরিক অভিযান। আজও অপারেশন জিব্রাল্টার সেদেশে সমানভাবে সত্য। দেখেশুনে মনে হয়, পাকিস্তানের একমাত্র আন্তর্জাতিক অ্যাজেন্ডা হলো ভারত বিরোধিতা, যার শুরু ১৯৪৭ সালে এবং যার মূল লক্ষ্য হলো কাশ্মীর দখল।

আসল কথা হলো, ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে উপর্যুপরি পর্যুদস্ত হয়েও ভারত বিরোধী জিগিরে কোনো ভাটা পড়েনি। উলটে তা বেড়ে গিয়েছে। এই অর্ধশতকে পাকিস্তানি শীর্ষ নেতৃত্বের মনোভাবে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। ভারতের বিরুদ্ধে সে দেশের নেতৃত্বের ঘৃণার মনোভাব, সামরিক বাহিনীর ভারত- বিরোধিতার জিগির এবং পাকজনতার একাংশের জিহাদি মনোভাব দু' দেশের মধ্যে সংঘাতের আবহাওয়া জিইয়ে রেখেছে। ইতিমধ্যেই দু' দেশের পরমাণুঅস্ত্র ভাণ্ডার স্ফীত হয়েছে। ভবিষ্যতে সংঘাত বাঁধলে ভারত না চাইলেও পাকিস্তান পরমাণুঅস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ষাটের দশকের শুরুতে পাকিস্তানের অস্ত্রভাণ্ডারে মজুত ছিল মার্কিন সমর সম্ভার। পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল মার্কিন মদতপুষ্ট। সে সময়ে অবশ্য সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ আজকের মতো মাথাচাড়া দেয়নি। শুধু মার্কিন মদত নয়, তৎকালীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ছিল জোট নিরপেক্ষ। আর ভারত ছিল এই জোটের নেতৃত্বে। তাই মার্কিন ও চীনের মতো দু' দেশের কোনো ব্লক থেকেই ভারত সাহায্য তো পায়নি, উলটে বিরোধিতা পেয়ে এসেছে। ভারতের আর্থিক মডেল ছিল সমাজবাদ এবং এখনও এদেশের অর্থনীতি সমাজবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, যদিও আজ আর সমাজবাদের অস্তিত্ব টিকে নেই দুনিয়া জুড়ে। ১৯৬২ সালে চীনের কাছে ব্যাপক পরাজয়ের কারণে ভারতের অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির ওপর গভীর প্রভাব পড়ে, যা ভারত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ এবং মার্কিন শাসকবর্গ পাকিস্তানকে আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করলে চীন পাকিস্তানকে কাছে টেনে নেয়, বানায় তার দোসর। আজও চীন পাকিস্তানকে মদত জুগিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন মুলুকে ৯/১১-য় বিস্ফোরণের পর পাকিস্তান সম্পর্কে মনোভাব পালটেছে আমেরিকা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেন ৯/১১ বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত বলে আমেরিকা মনে করে ২০১৩-তে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে তাকে নিকেশ করে মার্কিন প্রশাসন এবং এরপর থেকে পাকিস্তান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পালটে যায় ওবামা প্রশাসনের। সারমেয়র লেজ যেমন সোজা করা যায় না, তেমনি আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও পাকিস্তানের স্বভাব বদল করা যায়নি। তাই পাকিস্তানকে দুনিয়ার দরবারে একটা সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার কথা উঠছে। ২০১৪-এ নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং জোট নিরপেক্ষ জোটের আর কোনো অস্তিত্ব না থাকায় ভারত-মার্কিন সম্পর্ক অনেক সহজ। কারণ বিশ্ব আজ এক মেরুর। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানকে অনেক মূল্য জোগাতে হয়েছে। তারা নতুন করে কেবল ভারত বিরোধিতার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ অনেক বাড়িয়েছে। ১৯৬৫ সালে যেখানে তাদের সামরিক খাতে বরাদ্দ ছিল গড় জাতীয় উৎপাদনের ৪.৮৬ শতাংশ। ১৯৭১ সালে পুনরায় যুদ্ধের প্রাক্কালে সেই বরাদ্দ বেড়ে হয় ৯ শতাংশ। ১৯৭১ সালে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানে পাকিস্তানের লাভ তো কোনো হয়নি, বরং বাংলাদেশকে চিরতরে হারাতে হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ। উপরন্তু বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ হারিয়ে পাকিস্তান অনেকটাই দুর্বল হয়েছে খাদ্যশস্যে। তদুপরি ১৯৭৪ সালে ভুট্টোর সেই ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সদর্প বিখ্যাত উক্তি তার থেকে বেরিয়ে আসতে আজও পারেনি পাকিস্তান। ফলে সামরিক জুন্টা যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে মদত জুগিয়ে চলেছে তাতে সেখানকার অর্থনীতি আরও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং অচিরেই সরকারি সংস্থাগুলি মুখ থুবড়ে পড়বে। পাকিস্তানে এখন বিনিয়োগ বলতে যা চলেছে তা হলো পরিকাঠামোয় চৈনিক পুঁজি (যেমন সড়ক, রেল ইত্যাদি)। তাও আবার পুরোপুরি পাকিস্তানের স্বার্থে নয়। ভারতের সঙ্গে বৈরিতা জিইয়ে রাখতে চীন পাকিস্তানকে ব্যবহার করতে চায়।

পাকিস্তান বিগত ৫০ বছরেও বাস্তবকে চিহ্নিত করতে পারেনি। ভারতকে বিশ্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে গণ্য করছে। দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে। ভারত আর দুর্বল নয়। সামরিক, আর্থিক দৌড়ে অনেক এগিয়ে। অপারেশন জিব্রাল্টার, গ্র্যান্ড স্লামের মতো অভিযান চালবার মতো দুঃসাহস পাকিস্তান আর দেখাবে না বলে মনে হয়। শীঘ্রই ছায়াযুদ্ধ চালাবার সাহসও হারাবে পাকিস্তান। পাকিস্তান তার ভ্রান্ত নীতির ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই নীচে নেমেছে। ভবিষ্যতে যদি সে তার নীতি না বদলায় তখন কেবল আল্লাকেই রক্ষাকর্তা হিসেবে নেমে আসতে হবে।

অন্য রকম

নিজের কৃষিক্ষেত্রে সুন্দরাম ভার্মা।

রাজস্থানে কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিরূপ পরিবেশে কৃষিকাজ কীভাবে করতে হয় তা সুন্দরাম ভার্মার কাছে শেখার বিষয়। রাজস্থানের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলিও সুন্দরাম ভার্মার শরণাপন্ন। যাতে তাঁর এই বিশেষ প্রয়োগে কৃষিকাজ চতুর্দিকে শুরু করা যায়। কম জলে বিঘার পর বিঘা জমি কীভাবে চাষ করা সম্ভব তা করে দেখিয়েছেন সুন্দরাম ভার্মা।

রাজস্থানের অজ গ্রাম দান্তায় বেড়ে ওঠা সুন্দরামের। রাজ্যের দক্ষিণে শিকর জেলা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রাম। শৈশব থেকেই পড়াশোনার প্রতি ছিল ভীষণ আগ্রহ। কৃষি বিষয়ে নতুন নতুন প্রয়োগে খুবই আগ্রহী ছোটবেলা থেকেই। তিনি বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক হওয়ার পর দু'বার শিক্ষকতার জন্য নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও সেই পদ গ্রহণ করেননি। কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। কারণ কৃষি নিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার ইচ্ছা তাঁর মজ্জাগত। সেই কারণে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে থাকেন। এই মনোভাবই তাঁকে সাহায্য করেছে রাজস্থানের শুষ্ক মাটিতে সুন্দরভাবে ফসল ফলাতে।

রাজস্থানে জলের সমস্যা প্রবল। বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করে সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু বৃষ্টি নামমাত্র হয়। ফলে বালুকাময় এই এলাকার চাষিদের মাথায় হাত বছরের অর্ধেক সময়েই। কিন্তু ৫৫ বছরের সুন্দরাম ভাবতে শুরু করেন— এই পরিবেশে কীভাবে উন্নতমানের চাষ-আবাদ করা সম্ভব। এই ভেবেই তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। মাত্র ১ লিটার জলে চারা গাছকে সারা বছর বাঁচিয়ে রাখা যায় কীভাবে তা করে দেখিয়েছেন তিনি। সুন্দরাম ভার্মার এই সুপ্ত বাসনা শৈশব থেকেই ছিল। কারণ তাঁর পরিবারের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। নিজের চোখে তিনি দেখেছেন তাঁর বাবা-কাকারা কীভাবে কষ্টের সঙ্গে কৃষিকাজ করে দিনাতিপাত করছেন।

১৯৭৭-'৭৮ সালে অনাবৃষ্টির জন্য রাজস্থানের কৃষিকাজ ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় তিনি জয়পুরের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রকে অনুরোধ করেন যাতে তাঁর উদ্ভাবিত পথে কৃষকরা কৃষিকাজ শুরু করে। তাতে চাষিদের যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না, তেমনি কৃষিকাজও উন্নত মানের হবে। কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কে. বি. শর্মা এবং আর. ভি. এল গুপ্তা নামে দুই কৃষিবিজ্ঞানী তাঁর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন। সুন্দরামের নিজস্ব জমিতে চলে কৃষি গবেষণা। গত ছ' বছর ধরে তাঁরা সুন্দরামের দেখানো পদ্ধতিতে কৃষকদের উৎসাহিত করে চলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মাটি ০.৩ শতাংশ থেকে ০.৫ শতাংশ পর্যন্ত জল শোষণ করতে পারে। এক ঘনমিটার মাটির ৮০-৩০০ লিটার জল ধারণ ক্ষমতা আছে। জলের বাষ্পীভবন বন্ধ করতে পারলে সেই জল একটি গাছের জন্য যথেষ্ট।

সুন্দরাম জমিতে ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং দেড় ফুট গভীর গর্ত করে সেই গর্তে করে গাছ লাগানো শুরু করেন। গাছের গোড়ায় জৈব সার মিশ্রিত মাটি ও ১ লিটার জল ঢালা হয়। ছোট্ট চারা গাছ সেই জল শোষণ করে ভালোভাবে বেঁচে থেকে যথাসময়ে ফসল দিতে শুরু করে। গাছের গোড়ার মাটি যাতে না শুকিয়ে যায় তাই শুকনো লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এইভাবে সুন্দরাম ভার্মা বিঘের পর বিঘে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল এবং লঙ্কা, বেগুন ইত্যাদি সবজির চাষ করছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ২০০-এর বেশি প্রজাতির গাছ লাগান। এছাড়াও ১৫ রকমের ফসলের ৭০০ রকম প্রজাতি তিনি সংরক্ষণ করেছেন। এর মধ্যে ৪০০ প্রজাতির বীজ পুসা (কৃষিগবেষণা কেন্দ্র) অধিগ্রহণ করেছে। ৪০০-র মধ্যে ১৯৮ প্রজাতি বীজ সরকার পঞ্জীকৃত করেছে। বর্তমানে নিউ দিল্লী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চাষিদের কৃষি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। সেখানে গত ৩০ বছর ধরে এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সুন্দরাম ভার্মা। এখন কয়েক একর জমির মালিক তিনি। আর এইভাবেই তিনি লঙ্কা থেকে টমেটো সবই চাষ করে থাকেন। কৃষিকাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, কৃষিকাজ করতে কোনো রাসায়নিক সারের ব্যবহার না করে জৈব সার দিয়ে করা উচিত। এর ফলে মাটির উর্বরতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন বিভিন্ন রোগভোগের হাত থেকে গাছকে বাঁচানো সম্ভব। বস্তুত সুন্দরাম ভার্মার দেখানো পথেই আজ বালুকাময় রাজস্থান শস্যশ্যামলা হতে চলেছে।

সুন্দরাম ভার্মার ফোন নং—০৯১৪৯০১৭৬৪

থামুন! সামনে বিপদ

লেভেল ক্রসিংয়ে

একটু ধৈর্য আপনার জীবন এবং বাহনকে রক্ষা করতে পারে

একটি ট্রেন চোখের নিমেষে ১৫ মিটার এবং
সেকেন্ডে ২৫ মিটার পথ অতিক্রম করতে পারে, তাই

আগে ট্রেনকে যেতে দিন

যা করবেন

★ থামান আপনার বাহন

★ দেখুন রেললাইনের উভয় দিক

★ শুনুন কোন ট্রেন আসার আওয়াজ

★ পার হোন কোন ট্রেন আসছে না নিশ্চিত হয়ে, তবেই

থামুন

দেখুন

শুনুন

পার হোন

যা করবেন না

★ কখনোই বন্ধ লেভেল ক্রসিং গেটে তাড়াহুড়ো করে এবং আগত ট্রেন অগ্রাহ্য করে পারাপার করবেন না

★ লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ থাকলে আপনার গাড়ি থামান

★ কখনোই বন্ধ লেভেল ক্রসিং গেটের ওপর অথবা তলা দিয়ে পারাপার হওয়ার ঝুঁকি নেবেন না

মনে রাখবেন

মোটর ভেহিক্‌লস আইন, ১৯৮৮, ধারা ১৩১ এবং রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯, ধারা ১৬১ অনুসারে অসতর্কভাবে প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং পারাপার করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

মনে রাখবেন

রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৬০ ধারা অধীনে বন্ধ লেভেল ক্রসিং গেট দিয়ে জোর করে পারাপার হওয়া নিয়মানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

পূর্ব রেলওয়ে

পরিষেবাই আমাদের ঐতিহ্য

শ্যামাপ্রসাদ-গবেষকদের কাছে একটি অপরিহার্য তথ্য সূত্র

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

'ভারতমাতা কী জয়। কাশ্মীর ভারত কা অঙ্গ হ্যায়'।
'এক দেশমেঁ দো বিধান, এক দেশমেঁ দো নিশান
এক দেশমেঁ দো প্রধান—নেহি চলেগা—নেহি চলেগা।'

মৃত্যুর অনতিকালপূর্বে জম্মুর এক বিশাল জনসভায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই বিখ্যাত শ্লোগানটি তুলেছিলেন যা তাঁর অখণ্ড দেশভাবনার সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। মহান এই দেশপ্রেমিকের জীবন ও কার্যধারা বস্তুত রাষ্ট্রের অখণ্ডতাকে সুনিশ্চিত করতে এক নির্ভীক ও নিবেদিত অভিযান বলে বর্ণনা করা যায়। দুঃসাহসিক এই অভিযানকে সফল করতে তিনি তাঁর জীবনকে বাজি রাখতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। জম্মু-কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করবার নেহরুর গভীর চক্রান্তের পথে তিনি পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেজন্যই পৃথিবী থেকে অকালে সরে যেতে হয়েছিল তাঁকে।

দেশপ্রেমিক এই মানুষটি একাধারে ছিলেন একজন পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাস্তববাদী, রাষ্ট্রবাদী রাজনীতিক, অবিসংবাদী জননেতা ও অসাধারণ বাগ্মী। সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যেই বহুবিধ কর্মপ্রণালী তাঁর অসাধারণ মেধা, যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও কার্যদক্ষতার প্রমাণ দেয়।

স্বাধীন ভারতে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে ছিনিয়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে তৈরি হওয়া আজকের পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ছিলেন ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ। জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহরুকে চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নেন এবং কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেহরু কখনোই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাননি। মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করা নেহরু ড. মুখার্জী, প্রেমনাথ ডোগরা এবং সমমানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের 'সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল' হিসেবে দেখতেন। জম্মু-কাশ্মীর সমস্যা সর্বদাই তাঁকে ভাবিয়েছে এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এব্যাপারে নেহরুর সিদ্ধান্ত অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে। ভারতীয় গণতন্ত্রের নীতির পরিপন্থী ৩৭০ ধারা কাশ্মীরে বলবৎ করার বিরুদ্ধে তিনি সংসদের ভিতরে-বাইরে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা কতটা সঠিক ও সুদূর প্রসারী ছিল আজ তার প্রমাণ আমরা প্রতিপদে পাচ্ছি। নেহরুর বিজাতীয় ভাবনায় সহমত পোষণ ও মাথানত না করার অপরাধে স্বাধীন ভারতে তাঁর মতো আরও কত মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদের মধ্যে 'জম্মু-কাশ্মীর স্টাডি সেন্টার' একটি স্বতন্ত্রভাবনার সংস্থা। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে অধ্যয়ন করার সময় তারা অনুভব করে যে সেখানকার সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য ড. মুখার্জীর জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যধারা আজও দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবনের অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত সেই রাজ্যের মানুষদের অধিকার রক্ষায় সমস্ত বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন। জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে সমাজে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ পাঠককুলের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন যা এখনও দুর্লভ। ড. মুখার্জীর বক্তৃতা, চিঠি ও অন্যান্য লেখাগুলিকে সংকলিত করে একটি বই আকারে প্রকাশ করে তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস ও প্রকৃত সত্যকে জনসমক্ষে আনার লক্ষ্যে তাঁরা দিল্লীর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তরুণ গবেষক শ্রী দেবেশ খান্ডেলওয়ালাকে দায়িত্ব দেন। লেখক তাঁর 'Pledge For an Integrated India' বইটিতে মুখ্যত ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে ড. মুখার্জীর কাশ্মীর নিয়ে চিন্তাভাবনা ও কার্যপ্রণালীকে প্রামাণিক তথ্যসহযোগে অত্যন্ত সুসংহত ও কালানুক্রমিক ভাবে তুলে ধরেছেন। বইটির মধ্যে তাঁর সামগ্রিক রাষ্ট্রভাবনার একটা সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। নিছক ভাবাবেগ দিয়ে নয়, বরং প্রামাণ্য দলিল সহযোগে লেখক বইটির নামকরণের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেছেন। সূচনায় লেখক তাঁর বক্তব্যকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন এবং তারপর ধাপে ধাপে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছেন। বইটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথমপর্বে, লেখক কাশ্মীর নিয়ে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে ড. মুখার্জীর সংসদীয় বিতর্কের অংশ, নেহরু ও শেখ আবদুল্লাকে তাঁর লিখিত চিঠিপত্র, বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁর বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁর দেওয়া বিবৃতি ও প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয়পর্বে তিনি আটটি প্রামাণিক দলিল প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের ভারত ভুক্তিকরণ আইন সংক্রান্ত দলিল, আইনের বিভিন্ন তফশিল, কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে লেখা ভারতীয় প্রতিনিধির লেখা চিঠি, নেহরু ও শেখ সরকারের মধ্যে ১৯৫২ সালে সম্পাদিত আট দফা চুক্তি ইত্যাদি অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ নথি।

ইংরেজি ভাষায় বইটির আরো একটি আকর্ষণ হলো যে মুখবন্ধটি লিখেছেন ভারতীয় জনতাপার্টির বর্তমান সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ্‌। বইটি সমস্ত জাতীয়তাবাদী মানুষের অবশ্য পাঠ্য শুধু নয়, ড. শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে যাঁরা ভবিষ্যতে আরো গবেষণা করতে চান তাঁদের কাছে একটি অপরিহার্য তথ্যসূত্র হয়ে রইল।

PLEDGE FOR AN INTEGRATED INDIA
by Debesh Khandelwal
মূল্য : ২০০ টাকা।

বীরভূমে সন্ত সীতারামের পরিক্রমা

প্রতিদিন ১৪ কিলোমিটার পথ হেঁটে সন্ত সীতারাম এখন বীরভূমের গ্রাম পরিক্রমা করছেন। গ্রামে ৫ ধরনের পরিবারের কাছে যাচ্ছেন। গ্রামের প্রতিবন্ধীদের বাড়ি গিয়ে তাদের কুশল জানছেন। অনাথ পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। গ্রামের বাসিন্দা পটুয়া চিত্রশিল্পী, মৃৎশিল্পী, কুম্ভকার পরিবারের কাছে যাচ্ছেন। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুঃখী পরিবারের কাছে যাচ্ছেন। একই সঙ্গেও গ্রামের প্রধান বা মোড়লের সঙ্গেও মিলিত হচ্ছেন।

গ্রামের মধ্যেও যে সম্পদ আছে সেই সম্বন্ধে গ্রামের যুবকযুবতীদের স্মরণ করিয়ে দিতে তাদের নিয়ে আলোচনায় বসছেন। যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোরদের স্কুলমুখী করতে গ্রামের বাসিন্দা মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, অভিভাবকদের বোঝাচ্ছেন স্কুল যাবার প্রয়োজনীয়তা। বিকেলে গ্রামের ৪০ ঊর্ধ্ব বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন কীভাবে গ্রামে নেশার ঠেক বন্ধ করা যায়। নেশাগ্রস্তদের মূলস্রোতে ফেরাতে কী কী করা উচিত। গ্রামের উত্তরণে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে পথঘাট বানানো, গ্রামের সংস্কৃতি ও ঐক্য রক্ষায় প্রবীণদের এগিয়ে আসার কথা শোনাচ্ছেন।

প্রতিদিন ভোরবেলায় ৪টে থেকে পথে হাঁটা শুরু করছেন গেরুয়া বসন পরিহিত ওই সাধু। ১৪ কিলোমিটার পথ হেঁটে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম বা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাচ্ছেন। গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীদের কোনো বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছেন। নেই কোনো জাত বিচার। শুধু একটাই বার্তা গ্রামকে স্বাবলম্বী করতে হবে। গ্রামের সম্পদ রক্ষায় স্বজাগ হতে হবে গ্রামবাসীকে। সেই লক্ষ্যেই পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সারা ভারত পরিক্রমা করছেন। গত তিন বছরের হাঁটা পথে ইতিমধ্যেই উত্তরভারত, পশ্চিম ভারত প্রদক্ষিণ করে পূর্ব ভারতে হাঁটছেন তিনি। অসম, উত্তরবঙ্গ হয়ে দক্ষিণবঙ্গের বীরভূমে প্রবেশ করেছেন গত ১৬ সেপ্টেম্বর। নলহাটী ১নং ব্লকের নাগপুর কলিঠা কাবিলপুর খড়ুন হয়ে হেঁটে চলেছেন গ্রামের পর গ্রাম। গ্রামে আগেও অনেক সাধু এসেছেন। কিন্তু কেউ ধর্মের কথা না বলে গ্রাম বাঁচানোর কথা বলছেন তা শুনে অবাক গ্রামের আট থেকে আশি। নলহাটীর কাবিলপুর শেখ মহসীন বলেন, তিনি যে ধর্মেরই সন্ন্যাসী হোন না কেন, তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের উন্নয়ন। আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করেই শহরে চলে যেতে চাইছে। অথচ গ্রামের মধ্যে থেকেও যে উন্নয়ন করা যায় তার কথা বলেই তিনি যুবকদের গ্রাম রক্ষায় উৎসাহিত করছেন।

ঝাড়গ্রামে সংস্কৃত শিবির

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম নগরে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হলো দশ দিনের সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির। শিবিরে অধিকাংশ জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। গত ২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দু'টি স্থানে দু'টি শিবির চলে। শিক্ষক ছিলেন সব্যসাচী দলপতি। দু'টি শিবিরের মুখ্য আয়োজক ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঝাড়গ্রাম নগর কার্যবাহ উত্তম বেজ ও স্থানীয় শিক্ষক সন্দীপ চক্রবর্তী। দশ দিনের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পেরে ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। দু'টি শিবিরের মিলিত সমাপ্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় ৩০ সেপ্টেম্বর। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী অমলেন্দু দাস ও মুখ্য অতিথি সংস্কৃত ভারতীর প্রণব নন্দ। শিক্ষার্থীগণ সংস্কৃতভাষায় গান, নাটক, অনুভব কথন পরিবেশন করেন। উপস্থিত সকলেই সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন সংস্কৃত ভাষা চর্চার জন্য মিলিত হওয়ার অঙ্গীকার করেন।

সমাবেশ সমাচার

শোকসংবাদ

গত ২১ সেপ্টেম্বর কাশিমবাজার ভাটপাড়া শাখার স্বয়ংসেবক কালাচাঁদ কর্মকার (সত্যেন্দ্রনাথ কর্মকার) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে স্বয়ংসেবক হন এবং আমৃত্যু শাখা কার্যবাহ ছিলেন। এছাড়াও লাধুরাম তোষনিওয়াল সরস্বতী শিশুমন্দিরের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ে, দুই পুত্রবধূ ও দুই নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর দুই পুত্রই স্বয়ংসেবক।

***

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী প্রণব চক্রবর্তী সম্প্রতি মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলেজছাত্র প্রমুখের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

বাচামারী শিশুমন্দিরে মাতৃস্পর্শ অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের মতো এবছরও ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে পুরাতন মালদা বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের (বাচামারী গভঃ কলোনী) ২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠরত চতুর্থ শ্রেণীর ৫৮ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাতৃস্পর্শ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হলো। এদিন শিশুমন্দিরের পাঠরত তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মায়েরা তাদের বাড়িতে তৈরি করা খাবার স্বহস্তে শিশু ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য পঙ্কজ কুমার সরকার মাতৃমণ্ডলীকে শিশুমন্দিরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। মায়েদের উপহার স্বরূপ একটি করে মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তক দেওয়া হয়।

অসম সংস্কার ভারতীর ত্রিবর্ষীয় সঙ্গীতযাত্রা

আধুনিক সমাজের কাছে আতঙ্কবাদ শব্দটি গ্রিন হাউস এফেক্টের মতো সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। 'আতঙ্কবাদ' শব্দটি শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থেই নয়, এর ভয়ঙ্কররূপ আমরা নিত্য-নৈমিত্তিক দিন-চর্যায়, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের পর্দাতেও দেখতে পাচ্ছি। ভারতবর্ষের শিশু থেকে প্রৌঢ় তথা শান্তিপ্রিয় মানুষ এই সন্ত্রাসবাদের পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করছে। স্বাধীনতার পর থেকে অসম-সহ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত। আলফা, উলফা, সালফা, সংবিজিত (স্ব), কে. এল. ও প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী সক্রিয় সংগঠন গোটা উত্তরপূর্ব ভারতে বিভিন্ন নামে কাজ করে চলেছে। কিছুদিন আগে নাগাল্যান্ডের খাপলং জেলা থেকে ২৫টি স্কুলের ছাত্রদের মায়াবসারে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উগ্রবাদীরা নিয়ে যায়। এই বিষয়কে মাথায় রেখে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ড. ভূপেন হাজারিকাকে সন্ত্রাসবাদের উপর গীত রচনা করতে বলেন। তাঁরই ফলস্বরূপ ২০০২ সালে 'আতঙ্ক ঘোর আতঙ্ক/ আতঙ্কবাদ হুঁশিয়ার' নামক গানটি তিনি রচনা করেন।

সংস্কার ভারতী'র অসম শাখা 'নোহে আতঙ্কবাদ হৃদয়ে আত্মীয়তার সংবাদ' শীর্ষক 'আতঙ্কবাদ হুঁশিয়ার' গীতটির ত্রিবর্ষীয় ঐতিহাসিক যাত্রা হাতে নিয়েছে। আরও ঐতিহাসিক ঘটনা হলো ড. ভূপেন হাজারিকা গানটির সুর দিয়ে যেতে পারেননি। 'সংস্কার ভারতী' অসম শাখা'র সাধারণ সভায় ঐতিহাসিক ত্রিবর্ষীয় সঙ্গীতযাত্রা কার্যক্রম উপলক্ষে সংস্কার ভারতীর অন্যতম উপদেষ্টা এবং অসমের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত পরিচালক নন্দ ব্যানার্জী গানটির সুর দেন।

গত ৮ সেপ্টেম্বর ভূপেন হাজারিকার জন্মদিনে হিন্দুস্থানি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এক হাজার ছাত্রছাত্রীর সামনে 'নোহে আতঙ্কবাদ হৃদয়ে আত্মীয়তার সংবাদ' নামের ব্যানারে ত্রিবর্ষীয় ঐতিহাসিক সঙ্গীতযাত্রার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন অসম এবং নাগাল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল পি বি আচার্য এবং 'সংস্কার ভারতী'র কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক বাবা যোগেন্দ্রজী। উদ্বোধন কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন অসমের চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেতা এবং 'সংস্কার ভারতী' অসম প্রদেশের সভাপতি প্রাঞ্জল শইকীয়া এবং অসম প্রদেশের প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী হরিমোহন দাস। এই সঙ্গীতযাত্রা মূল শ্লোগান— 'আতঙ্কবাদ হুঁশিয়ার উজ্বলিছে মানবতাবাদ'। 'আতঙ্কবাদ হুঁশিয়ার' গীতটি অসম-সহ উত্তরপূর্ব ভারতের সমস্ত জনজাতি এবং আঞ্চলিক ভাষাতে অনুবাদ করে তার প্রচার ও প্রসার করা হবে। আগামী ৫ নভেম্বর ভূপেন হাজারিকার মৃত্যুদিনে প্রাদেশিক স্তরে প্রথম 'আতঙ্কবাদ হুঁশিয়ার' গানটির অনুশীলন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে অসম-সহ উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যে জেলাস্তরে প্রতিটি স্কুল-কলেজে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পর্যায় ক্রমিক ভাবে অনুশীলন কর্মশালা চলতে থাকবে। তিন বছর পর অর্থাৎ ২০১৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ত্রিবর্ষীয় ঐতিহাসিক সঙ্গীতযাত্রার সমাপ্তি কার্যক্রম হবে।

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সভা

গত ২ থেকে ৪ অক্টোবর হরিয়ানার গুরগাঁও-তে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সভায় আগামী তিন বছরের জন্য কর্মসূচির নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পথনির্দেশ করেন মধুভাই কুলকার্ণি, যোগেন্দ্রজী প্রমুখ। সভায় অখিল ভারতীয় সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি--- চিত্রশিল্পী বাসুদেব কামাথ। সহ সভাপতি--- বাঁকেলাল গৌড়, সাধারণ সম্পাদক— বিশ্রাম জামদার, সহ সম্পাদক--- ড. রবীন্দ্র ভারতী, সংগঠন সম্পাদক--- গণেশপন্থ রোড়ে, আমীর চাঁদ, পি. আর. কৃষ্ণমূর্তি, কোষাধ্যক্ষ--- সুভাষ আগরওয়াল। দক্ষিণবঙ্গ থেকে শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, ভরত কুণ্ডু, বিকাশ ভট্টাচার্য আমন্ত্রিত কার্যকরী সদস্য হিসাবে আগামী তিন বছরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টার।

প্রবীণ নাগরিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী, পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতাপার্টির সহ সভাপতি এবং শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উপদেষ্টা যুগলকিশোর জৈথলিয়ার ৭৯তম জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে শুভেচ্ছা প্রদান করে। ছবিতে শ্রী জৈথলিয়াকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সজ্জন তুলসীয়ান, প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, যোগেশরাজ উপাধ্যায়, মহাবীর বাজাজ, অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, গিরিধর রায়, গোবিন্দ জৈথলিয়া।

গত ১১ অক্টোবর শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে বিনোদ কুমার শুক্ল, প্রকাশ ত্রিপাঠী, রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, মহাবীর বাজাজ, ড. বুদ্ধিনাথ মিত্র এবং যুগলকিশোর জৈথলিয়া।

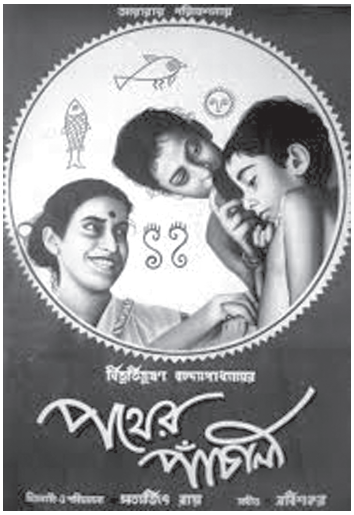

‘পথের পাঁচালী’-র ষাট বছর

বিকাশ ভট্টাচার্য

বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চলচ্চিত্র ‘পথের পাঁচালী’ বসুশ্রীতে মুক্তি পায় ১৯৫৫ সালে। এ বছর ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তির ষাট বছর। দৃশ্যকলা বিষয়ের ছাত্র, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করা এক যুবক বানালেন এক আপাদমস্তক দীর্ঘ কবিতা। শোনা যায়, এ ছবি তোলার সময় একটি উপযুক্তমানের মজবুত ক্যামেরাও তাঁর আয়ত্তে ছিল না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধ্রুপদী সাহিত্যকর্মের চিত্ররূপ দেওয়ার পেছনে এক কাহিনি আছে। সত্যজিৎ জায়া বিজয়া রায় ‘প্রদীপ জ্বালাবার আগে’ রচনায় লিখেছেন, ‘পথের পাঁচালী’কে ঘিরে আমাদের আবেগ, উত্তেজনা আর ভালবাসার স্মৃতি অফুরান, বিশেষত সম্ভাবনার সূচনাটি বড়ই মধুর। মানিক তখন ডি.জে. কিমার-এ চাকরি করেন। ১৯৫০ সালে অফিস থেকে প্রস্তাব এলো লন্ডন যাবার। আমার শাশুড়ি মা বললেন, মানিক একা যাবে কেমন করে? মামনিও সঙ্গে যাক। মানিক বললেন, সে আবার হয় নাকি? অফিস বলল, কেন হবে না। নতুন বিয়ে হয়েছে তোমাদের। মনে করো এটা আমাদের পক্ষে হনিমুন গিফ্‌ট। তখন তো আর এত প্লেন-টেন হয়নি! যেতে হলো জাহাজে। তবে সে অভিজ্ঞতা একেবারে অন্যরকম। এত ভাল লেগেছিল। লন্ডনে কাজের ফাঁকে আরও অনেক ছবির সঙ্গে ডি সিকা’র ‘বাইসাইকেল থিব্‌স’ দেখলাম। এই ছবি দেখেই ফিল্ম করবার ভাবনা মাথায় আসে মানিকের। আর, বিলেত যাত্রার সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পর, সিগনেট-এর দিলীপকুমার গুপ্ত--- ডি. কে ওঁকে একটা কাজ দিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ বইটি দিয়ে বলেছিলেন, এর কিশোর সংস্করণ ‘আম আঁটির ভেঁপু’র জন্য অলঙ্করণ করে দিতে। ‘পথের পাঁচালী’ মানিক আগে পড়েননি শুনে একটু বকেও দিয়েছিলেন। যাবার পথে সময় হয়নি। ফিরবার সময় মানিক জাহাজে বইটি পড়লেন। পড়ে একেবারে অভিভূত। এবং উত্তেজিত। বললেন আমার সিনেমার জন্য এ একেবারে আদর্শ বই। কম খরচে করাও যাবে। সবটাই আউট-ডোর শুটিং। স্টুডিও ভাড়া করতে হবে না। প্রফেশনাল অভিনেতা-অভিনেত্রী নেব না। সব বন্ধু-বান্ধব। কম পয়সায় সিনেমাটা হয়ে যাবে। সুতরাং কলকাতায় ফিরেই শুরু হয়ে গেল ছবি তৈরির তোড়জোড়। কিন্তু কম পয়সায় হবে বললেও তো সেই পয়সাটুকুও চাই। নিজেদের যা কিছু সঞ্চয়— ভাল ভাল আর্টের বই, রেকর্ড, ইনসুরেন্স পলিসি— সব বিক্রি করা হলো। আর আমার গয়না বিক্রি করা হয়নি যদিও, বন্ধক দেওয়া হয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে আমাদের খুব অন্তরঙ্গ বলাই চ্যাটার্জী, নির্মল চ্যাটার্জি, প্রশান্ত কুমার মহলানবীশের ভাই বুলা মহলানবীশ টাকা ধার দিয়েছিলেন। আর টাকা দিয়েছিল কিশোর। কিশোর কুমার। দরাজ দিল কিশোর সে টাকা ফেরতও নেয়নি।

এই হলো বিজয়া রায়ের কথায় ‘পথের পাঁচালী’র প্রাক সূচনাপর্ব। শুরু করেও এই ছবির কাজ অর্থাভাবে বার বার বন্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রানা অ্যান্ড দত্ত নামে এক প্রযোজনা সংস্থা ছবিটি প্রযোজনার ও পরিবেশনার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু কিছুকাল পরে তারাও পেছিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, টাকা ফেরত চেয়ে বসলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রযোজনার দায়িত্বে পাওয়া গেল। এত অর্থকষ্টের মধ্যে যে ছবি তৈরি হলো— সেই ছবিটি পরবর্তীকালে, এমনকী আজ পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে। ১৯৫৯ সাল পর্যন্তই লাভ হয়েছিল বারো লক্ষ টাকা। আজও প্রতি বছর সরকারের ঘরে এই ছবি বাবদ অর্থ জমা পড়ছে। অবশ্য এই লাভ থেকে একটা পয়সাও সত্যজিৎ বা ছবির টেকনিশিয়ানরা পাননি। সত্যজিৎ একবার পরিহাস ছলে বলেছিলেন, ‘দে গেট দি মানি বাট্ আই গট ফেইম।’

‘পথের পাঁচালী’ ছবির সম্পাদনায় ছিলেন তখনকার অভিজ্ঞ প্রবীণ সম্পাদক দুলাল দত্ত। এক স্মৃতিচারণায় উনি লিখেছেন, ...‘পথের পাঁচালী’ প্রথম প্রদর্শিত হলো বিদেশে। জন হস্টন নামে একজন একটা প্রাইভেট শো-তে ছবিটি দেখেছিলেন। তাঁরই আগ্রহে ছবিটি বিদেশে প্রদর্শিত হয়। বসুশ্রীতে প্রথম পাবলিক শো। হল ফাঁকা। মানিকদা বাইরে রুমাল কামড়াচ্ছেন। ওঁর টেনশন প্রকাশের ওটাই ছিল ভঙ্গি। পরে অবশ্য একটু একটু করে ভিড় হতে লাগল। সাতদিন পর আনন্দবাজারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। পঙ্কজ দত্ত রিভিউ করেছিলেন। এদিকে নিউইয়র্ক থেকে খবর এল, ‘পথের পাঁচালী’ সেখানে অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে। সাগরময় ঘোষ পঙ্কজ দত্তকে খবরটা দিতেই উনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। মানিকদাকে খবরটা দেওয়া হলো। তারপর তো সব ইতিহাস। আমাদের সব পরিশ্রম, সব উদ্বেগ শেষ। হাতে যেন হীরক খণ্ড পেলাম। ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।’

সংশোধনী

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘হারিয়ে যাওয়া হরর ফিল্ম’— রচনায় রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল গল্পের চলচ্চিত্র রূপ ‘সন্ধ্যারাগ’ বলে উল্লেখিত হয়েছিল। সেটি হবে ‘সন্ধ্যারাণী’।

—স্ব: স:

শব্দরূপ-৭৬৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

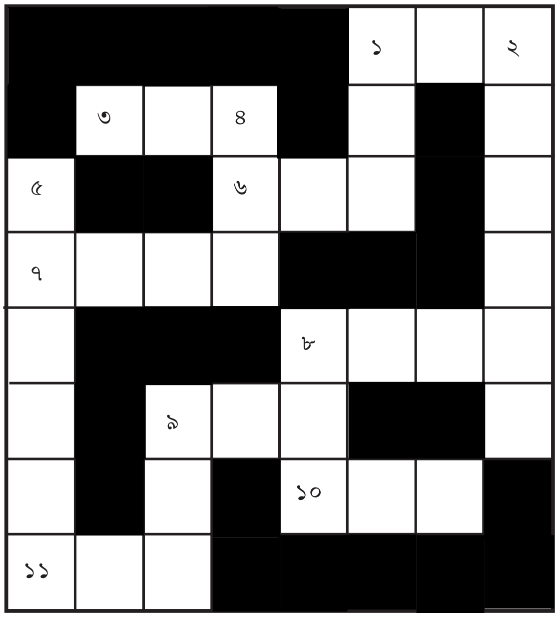

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** বড় আয়ী, মাতামহী বা পিতামহীর মাতা, **৩.** 'কিরাতার্জুনীয়'—রচয়িতা সংস্কৃত কবি, **৬.** বলবর্ধক ওষুধ, **৭.** যে জেনে পাপ করে, **৮.** ঢেউ ওঠা, **৯.** জলজ, পদ্ম, **১০.** যযাতির পিতা, **১১.** কবচ, মাদুলি।

উপর-নীচ : **১.** সওদাগর, ব্যবসায়ী, **২.** ডিরোজিও-র অনুগামী সম্প্রদায়, **৪.** বৃক্ষ, **৫.** জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা; বৌদ্ধমতে দেবীরূপে কল্পিত, **৮.** পাখা, চামর ইত্যাদির বাতাস দেওয়া, **৯.** নীচজাতি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬২
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
নবেন্দু সরদার
আমতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

গ			যা	জ্ঞ	ব	ল্ক্য	
বা			জ		র		
ক্ষ	প	ণ	ক		রু		
	জ্ঞি			পাঁ	চি	ল	
	কা	প	ড়			ল	
		ঙ্গ		বি	শ্ব	না	থ
		মি		র			ম
	গ	ল	গ্র	হ			ক

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৬৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

বিজেপি'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ভুলই জেড-ইউ জোটের ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ করবে

সুশীল মোদী

কথায় বলে কী ধরনের মানুষের সঙ্গে সে মিশছে তা দেখেই একজন মানুষের পরিচয় বোঝা যায়। বিষয়টা একবারে সরল হয়ে যাবে বেশিদূর না গিয়ে শুধুমাত্র আসন্ন বিহার নির্বাচনের দিকে তাকালেই। মনে রাখা দরকার, বিহারে এই অভূতপূর্ব বিকাশের ধারা লাগু ছিল যতদিন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার বিজেপি'র সঙ্গে দু'বার নির্বাচিত সফল জোট সরকার চালাচ্ছিলেন। বিশেষ করে রাজ্যটি যখন দীর্ঘ পনেরো বছরের লালু-রাবড়ি পরিবারের পারিবারিক শাসনের দাপটে ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এনডিএ সরকার বিহারবাসীকে লাগাতার উন্নয়নের দিশা দেখিয়েছিল কেননা কেবলমাত্র সুশাসনই ছিল সরকারের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ও চালিকাশক্তি।

কিন্তু হায়! ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসতেই নীতিশজীর মাথায় কোনো এক অলীক তৃতীয় ফ্রন্টের নেতা হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা চাগাড় দিয়ে উঠল। পরিণতিতে জোটসঙ্গী বিজেপি-কে তিনি অবলীলায় ছুরি মারলেন। বেরিয়ে গেলেন জোট ছেড়ে। বেরিয়ে গিয়েই হাত ধরলেন এমন একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের যাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেই তিনি ক্ষমতায় বসেছিলেন। আর যাঁর কারণেই বিহার রসাতলে পৌঁছেছিল। পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যায় এনডিএ ছেড়ে আসার আড়াই বছরের মধ্যে বিহার উন্নয়নের কাজকর্ম প্রায় শিকেয় উঠেছে।

আজকের বিহারবাসী আবার সেই জঙ্গলরাজের ভয়ঙ্কর দিনগুলির স্মৃতি টের পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে এর সম্পূর্ণ দায় চাপাচ্ছেন নীতিশজীর ওপর। নীতিশকুমার সম্প্রতি দাবি করেছেন দেশের উন্নয়নের নানান গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিতে বিহার নাকি দেশের গড়কে ছাড়িয়ে গেছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বরে লেখা তাঁর নিবন্ধটির সূত্রেই জানাচ্ছি যে এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর হতে পারে না। নীতিশকুমার সারা দেশের (Macrolevel) বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে নিজের সুবিধে মতো, পছন্দমতো খাপছাড়া কিছু তথ্যকে বেছে নিয়ে একটা মনপসন্দ সুন্দর চেহারা উপস্থাপিত করেছেন। যাতে তাঁর শাসন যে সুশাসনের ধারা বজায় রেখেছে এমনটা প্রমাণ করা যায়। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

আজকের বিহার জাতীয় মানদণ্ডে আবার পেছনে পড়ে গেছে। বিহারে এখন একান্ত প্রয়োজন উন্নয়মুখী সুশাসনের। একটু নজর করলেই দেখা যাবে ২০০৫-২০১৩ এই আট বছরের সময়পর্বে বিশেষত ১৯৯০ থেকে ২০০৪ ও বিজেপি জোট পরবর্তী বর্তমান ২০১৩-২০১৫ এর আমলের তুলনায় কী বিশাল অগ্রগতির মাত্রা ছুঁতে পেরেছিল। কারণ বিজেপি-নীতিশ জোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সদর্থক নীতিগত পরিবর্তনে হাত দিয়েছিল। সদ্য প্রকাশিত ২০১৩-১৪ সালে বিহারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ৯.৯২ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে ১০.৭৪ শতাংশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিসংখ্যান থেকে এটি যে কম তা বলে দিতে হয় না। তেমনি ২০১১-১২ সালে সাধিত ১০.২৯ শতাংশও যে আজকের পরিসংখ্যানের ওপর ছিল তাও সহজবোধ্য। রাজ্যের নেট জেডিপি-র পরিসংখ্যানে ঢিলেমি খামতি আরও বেশি করে নজরে পড়বে যদি আজকের দামের ভিত্তিতে ২০০৪-০৫-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। নেট স্টেট ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (এন এস ডি পি)-এর বৃদ্ধি ২০১০-১১ মিলে ছিল ২৫.৪ শতাংশ, ২০১১-১২-তে ছিল ১৯.৮ শতাংশ, ২০১২-১৩-তে ২২.০০ শতাংশ কিন্তু এই ক্রমিক বৃদ্ধি বা উচ্চহার ২০১৩-১৪-তে গোঁত মেরে নেমে এসেছে ১৬.২ শতাংশে।

বিহারে প্রথম দফার ভোটে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন।

রাজ্যের শিল্পক্ষেত্র এমনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি যা দেখে শাসনের ধাঁচা যেমন বোঝা যায় তেমনি এখান থেকে উঠে আসে রাজ্যের চাকরি ক্ষেত্রে নিযুক্তির পরিসংখ্যান। জোট সরকারের আমলে ২০১১-১২ সালের শতকরা কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধি থেকে ২০১৩-১৪- তে তা নেমে এসেছে ১৮.৪ শতাংশে। এর প্রমাণ মিলবে সদ্য প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকাশিত 'ease of doing business' (কারবার করার স্বাচ্ছন্দ্য)-এর মাপকাঠিতে। যে গুজরাটের নাম শুনলে নীতিশজীর অ্যালার্জী দেখা দেয় দেশের মধ্যে ব্যবসা করার পরিবেশ আনুকুল্যে তা প্রথম আর দুঃখের সঙ্গে বিহারের স্থান সেখানে ২১ নম্বরে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটনের মানচিত্রটিও লক্ষ্য রাখার বিষয়। আজকে দেশের বিভিন্ন রাজ্য Tour & Travel (পর্যটন)-এর ক্ষেত্রে নিজেদের রাজ্যকে সফলভাবে বিপণন করে অর্থাগমের পথ সহজ করছে। এদিক থেকে বিহার নানান ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঘটনা ও ভাবনার পীঠস্থান। বিশ্বমানচিত্রেও এর উল্লেখ আছে। এনডিএ আমলে প্রতি বছরে বিদেশি ভ্রমণকারীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ছাড়িয়ে যেত। বর্তমানে সেই সংখ্যা ১০ লক্ষের নিচে নেমে গেছে। এর কারণ গয়া বিস্ফোরণের পর রাজ্যের তরফে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্ভাব্য পর্যটনকারীদের মধ্যে সাহস যোগানোর কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি।

প্রসঙ্গত নীতিশজী ঘোষণা করেছেন বিহারের ৪০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩৬ হাজারই আলো ঝলমল করছে। বিহার সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ যুক্ত একটি রাজ্য প্রায় হয়ে পড়েছে। তিনি বলেননি এই বিদ্যুৎ থাকে কতক্ষণ। বিহারে ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতি ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল ক্ষতি করছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও নিম্নগামিতা প্রকট।

এ প্রসঙ্গে সকলেই জানেন যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সুনিয়ন্ত্রণ। মানুষ যদি নিরাপত্তহীনতায় ভোগে সেক্ষেত্রে তারা তো বিনিয়োগ করতে ভয় পাবে। কেই বা বুক ঠুকে নতুন কলকারখানা বসাবে বা ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিতে যাবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজকের বিহারে আবার সেই ২০০৫ সালের আগের কালোদিনের করাল ছায়া ঘনায়মান। অপহরণ, তোলাবাজী, খুন যেগুলি এই জঙ্গলরাজের সাক্ষী ছিল সেগুলি আবার পূর্ণমাত্রায় ফিরে এসেছে। স্মরণে আসবে এনডিএ জমানায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গে দ্রুত ফৌজদারি মামলাগুলির নিষ্পত্তি করে অপরাধীদের ওপর সরকার লাগাম পরিয়েছিল। আজকের আরজেডি-র প্রধান লালুর সঙ্গে সমঝোতা করে মুখ্যমন্ত্রী আবার অপরাধীদের লাঠি ঘোরাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। রাজ্য চলে যেতে বসেছে তাদের হাতে। বিদায় নিচ্ছেন বিনিয়োগকারী আর শিল্পপতিরা।

এই সূত্রে নীতিশজীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলিই পক্ষান্তরে বিহারের হতদরিদ্র চেহারাটাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেনেই নিয়েছেন যে তাঁর রাজ্যে ন্যূনতম সুবিধেগুলি থেকেও রাজ্যবাসী বঞ্চিত। 'নীতিশ সূত্র' নামে বাজারে প্রচারিত ৭টি ক্ষেত্রে তুমুল অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়গুলি, যেমন— জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট এসবের উন্নতি তো দশ বছরের শাসনকালে কবেই হয়ে যাওয়ার কথা।

প্রসঙ্গত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই ধরনের বুনিয়াদি ধারার পরিষেবা প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার ন্যূনতম সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত করার রেকর্ড রয়েছে। এই মাপকাঠিতেই রাজ্যবাসীর উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষায় বিজেপি-ই একমাত্র সমাধানমুখী দলের ন্যায্য দাবিদার হতে পারে। এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে কেন্দ্রের ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকার বিহার প্যাকেজ যার সুষ্ঠু সম্পদ সৃষ্টিকারী বন্টন ও ব্যয় আজ যোগ্য সরকারের অপেক্ষায়।

শুধুমাত্র অনুদানের রাজনীতির বদলে আজ নির্দিষ্ট প্রকল্পভিত্তিক Skill India ও Make in India-এর যথাযথ প্রয়োগ রাজ্যের তরুণদের জন্য সুযোগের বন্যা বইয়ে দিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোগীদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্মিত 'মুদ্রা ব্যাঙ্ক' অতি সহজে এখন মূলধন সরবরাহে তৈরি। এখানে কোনো কোল্যাটারাল সিকিউরিটির প্রয়োজন নেই। মনে রাখতে হবে কোটি কোটি এক বা দু' জনের উদ্যোগে চলা ক্ষুদ্র শিল্পদ্যোগ এখনও গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বিহার একটি কৃষিভিত্তিক রাজ্য হওয়ায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের এখানে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। একদিকে যেমন— সেচ, বিদ্যুৎ ও কৃষি উপকরণের যোগান নিশ্চিত করতে হবে তেমনি উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যথাযথ বিপণনের ব্যবস্থা করলেই কৃষিজীবীরা তাদের পণ্যের পর্যাপ্ত দাম পাবে। আসবে সমৃদ্ধি।

বিগত ২৫ বছরে, কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে একে অপরের ওপর দোষারোপের ফলে বিহার ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজকে বিহারবাসীর কাছে একটি সুবর্ণ সুযোগ এসেছে রাজ্যে আর কেন্দ্রে একই দলের একটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সরকারকে বেছে নেওয়ার।

একথা নিশ্চিত প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বের কারণে ও তাঁর উন্নয়নের সোনালি সম্ভাবনার পরিকল্পনাগুলি প্রয়োগ হলে বিহারবাসী নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবেন। আমি এও নিশ্চিত জানি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও নির্বাচন সংবেদনশীল বিহারবাসী আসন্ন অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সে সুযোগ হাতছাড়া হতে দেবেন না। তাঁরা প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তই নেবেন। হ্যাঁ, তাঁরা জঙ্গলরাজের প্রতিভূদের পরাজিত করে আসন্ন দীপাবলির রাতকে উন্নয়নের দীপশিখার উদ্ভাসে আলোকিত করে তুলবেন।

(লেখক বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী)

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
19 October - 2015 - Rs. 10.00